অপেক্ষা

হুমায়ূন আহমেদ

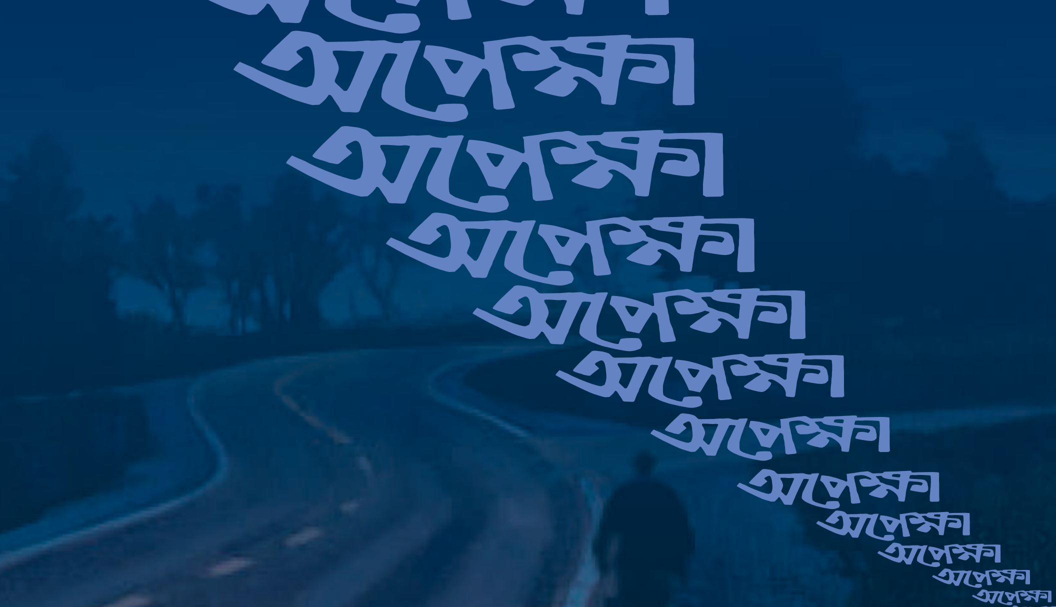

মানবজীবন অপেক্ষাময়। হোক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক– অপেক্ষাই হয়তো মানবজাতির প্রধান নিয়তি। এর রকম-সকমও যে কতো তা নির্ণয় করা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদেরও অসাধ্য। কেননা ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে যে অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা এবং তা পূরণ-অপূরণের যে মধ্যবর্তী সময়, এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরিমাপের কোনো মানযন্ত্র নেই। পরিণামে স্বপ্ন-প্রত্যাশা-প্রচেষ্টার সবটুকু সময়জুড়েই চলে অপেক্ষার খেলা। আর এই খেলার হারজিত দিয়েই আমরা জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব কষি।

হাসনান আহমেদ 'অপেক্ষা' বইটিতে নায়কের জবানিতে তাঁর নিজের সময়ের ব্যক্তিগত, জাতীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি; বৈরী বাস্তবতাতেও অগণন মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি-নিরাপত্তার জন্য স্বপ্নময় অন্তহীন অপেক্ষা এবং বারবার হোঁচট খাওয়ার পরও দাঁড়িয়ে থাকার গল্প শোনাতে চেয়েছেন আমাদের। কারণ এই খেদ ও ক্ষুধা, হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের অংশীদার তো আমরা সবাই। কেননা মুক্তিযুদ্ধের সাড়ে চার দশক পরও আমাদের সত্যিকারের স্বাধীনতা মেলেনি, অন্যদিকে রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজনীতির খেলাধুলায় আমাদের অনেকের ব্যক্তিগত জীবনও গেছে ছিন্নভিন্ন হয়ে। বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ লড়াই আর বিপুল রক্তদানের পরও আমাদের অর্জন সামরিক স্বৈরতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কতিপয়তন্ত্র। ফলে অনেক পুরনো অপেক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুনতর অপেক্ষা। বাড়ছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, হতাশাজনিত ক্লান্তি। তবু এসবের ভেতর দিয়েই আমরা বেয়ে চলেছি জীবনতরী।

এ বইটি আসলে উপন্যাসের ভঙ্গিতে লেখা আমাদের সংক্ষুব্ধ সময়েরই এক ঐতিহাসিক দলিল।

সৈকত হাবিব
কবি

অপেক্ষা

হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

অপেক্ষা

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৭

প্রকাশক
প্রকৃতি
১ কনকর্ড এম্পোরিয়াম (বেজমেন্ট)
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: prokriti.book@gmail.com

প্রচ্ছদ
হাসনান আহমেদ

মুদ্রণ
অর্ক
৩/১, ব্লক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯১৪৮৫-৩-১

মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

Opekkha by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, August 2017
Price: Tk. 300.00

উৎসর্গ

মায়াঘোরে বাঁধা সেই পথভোলা
কপোলকল্পিত '**কণিকা**'কে,
যে আমার মানসলোকে সারাক্ষণ
জাগ্রত থাকে।

আমার কথা

‘আমি নদীর মতো কত পথ ঘুরে তোমার জীবনে এসেছি’— গানটা বেশ আগে শুনেছিলাম। আমিও বহমান নদীর মতো কত বিস্তীর্ণ সর্পিল-দিঘল পথ বেয়ে জীবন সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখায় উপনীত হয়েছি। আর বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ সুপরিসর একটা সক্রিয়-জীবনের প্রান্তভাগ মানে অজস্র জীবন-পথের ক্রমাগত ক্রসিং ও অপরিমেয় ঘটনার বিপুল সমাবেশ। এ জীবনালেখ্য লেখা ও বলার কোনো শেষ নেই। প্রতিদিন বাস্তবে যা দেখি এবং তা থেকে যা ভাবি, তার নির্ভেজাল-অসংকোচ প্রকাশ সত্যিই দুরূহ। তবুও সময় উপান্তে, বলে যেতে হয়।

নিজে শিক্ষক হওয়াতে শিক্ষকদের জীবন ও জীবনী জানতে ও বিশ্লেষণ করতে আমার সীমাহীন আগ্রহ। এ লিখন সে আগ্রহের নিবিড় রূপায়ণ।

সজীব এহসান আমার সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আমাকে বেলাশেষে তার ব্যক্তিগত জীবনের নিস্তরঙ্গ-নিরন্তর ‘অপেক্ষা’ নিয়ে সখেদে আখর দিতে বলেছিল। আমি অনুলেখক হিসেবে সজীবের ‘অপেক্ষা’র সাথে প্রাত্যহিক জীবন-চেতনা ও কিছু ‘অপেক্ষা’র কথামালা আমার স্বভাবসুলভ রীতিতে কালির আখরে রেখাঙ্কিত করেছি। আমার এটুকুই সান্ত্বনা যে, পেশার কারণে আমি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে সত্যকে ধারণ করার চেষ্টা করেছি।

আমার এ ‘ইতিবৃত্ত-স্মরণিকা’ পাঠকসমাজে কতটা সমাদৃত হবে, আমি তা দেখার অপেক্ষায়।

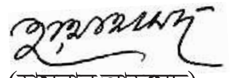

ঢাকা, আগস্ট ২০১৭

(হাসনান আহমেদ)

অপেক্ষা

এক

সেমিনার শেষে দুজনে নীচে নেমে এলাম। রাতের মতো একটা আশ্রয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। একটু দূরে এক হোটেলে একসাথে রাতটুকু কাটাবো বলে ভেবেছি। ও আমার পুরোনো ছাত্র, বর্তমানে সহকর্মী। দুজনেই সাগরতীরের এক হোটেলের হলরুমে সেমিনারে অংশ নিতে এসেছি। আয়োজক অফিসের গাড়িটা তখনও আমাদের কাছে পৌঁছেনি। ড্রাইভার আমাদেরকে আরেকটু অপেক্ষা করতে বলছে। আমি এই বেলাশেষে একাকী সাগরতীরে একবার যাব বলে মনে মনে ভেবেছি। সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ অস্থিরতা বাড়ছে। ওর দিকে বার বার তাকাচ্ছি। কখনো তার দিকে তাকিয়ে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। দাড়ি মুখে, টুপি মাথায়, পুরো বড় আলখেল্লা-পরা জবরদস্ত এক হুজুর।

আমার অবিরাম অস্থিরতা দেখে সে বার বার আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'স্যার, আরেকটু অপেক্ষা করুন। গাড়ি এখনই এসে যাবে।'

আমি তাকাচ্ছি তার পোশাকের দিকে, নুরানি চেহারার দিকে। যদি একবার আমার হাতটা ধরে, কাছে টেনে একটা শুভাশিস লম্বা-ফুঁ আমার আপাদমস্তক লক্ষ করে দিয়ে দেয়, তো আমার ইহকাল ও পরকালের নাজাতের বন্দোবস্ত সুনিশ্চিত। রোগ-শোক, বালা-মুসিবত কোথা দিয়ে এক-দৌড়ে পালাবে, দুশ্চিন্তা দূর হবে। জন্ম-থেকে-জ্বলা জীবনে প্রশান্তি আসবে। নিরন্তর অপেক্ষার পালা শেষ হবে। এ হবে এক অভাবিত পাওয়া। এই অস্থির মুহূর্তে আমি তার ফুঁ পাবার অপেক্ষায় আছি।

'অপেক্ষা' শব্দটা নিদারুণ মর্মব্যথার। অপেক্ষার প্রহর বড্ড মর্মভেদী, নির্মম, অসহনীয়। 'প্রতীক্ষা', 'সবুর', 'প্রত্যাশা' শব্দগুলো 'অপেক্ষা' শব্দের সমার্থক বলে ধরে নেয়া হয়। 'প্রতীক্ষা' কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অপেক্ষা'র কাছাকাছি অর্থবোধক, যা ঘটতে পারে— সে বিষয়ের জন্য অপেক্ষা। আবার 'সবুর' শব্দের মধ্যে ধৈর্য ও সহ্যের ভাব নিহিত আছে। কখনো কখনো ধৈর্যের বাঁধ টুটে যেতে পারে, সহ্যের সীমাও পেরিয়ে যেতে পারে। 'প্রত্যাশা' শব্দের মধ্যে একটা

আশাজাগানিয়া গন্ধ বিদ্যমান, আশা করলেই যে সে-আশা পূরণ হবে এমন কোনো কথা নেই। সে-আশা নিরাশাও হতে পারে।

লালন শেষ বয়সে এসেও গেয়েছিলেন, 'আশা পূর্ণ হলো না, আমার মনের বাসনা।' তিনিও নিশ্চয়ই কোনো কিছুর আশায় ছিলেন। আশা পূরণের জন্যই তো অপেক্ষা। অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী— আবার যুগ যুগান্তরব্যাপী, কখনো-বা অনন্ত। কথায় আছে, 'আশায় সংসার'। আশা আছে, তাই বিশ্বসংসার টিকে আছে। 'তুমি আছো সবই আছে, তুমি নাই কিছু নাই।' আশা জীবনজুড়ে।

এই আশার মুলো নাকের ডগায় ঝুলিয়ে কোনো পক্ষ নিজস্বার্থ উদ্ধারে মেতে উঠতে পারে। এভাবে আবার যুগ যুগ পারও করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে আশাহতের বেদনা যারপরনাই কষ্টদায়ক। অন্তরকে ভেঙে খান-খান করে দেয়, দুমড়ে-মুচড়ে চুরমার করে দেয়। তাই শত নিরাশার মাঝেও মিট-মিট করে জ্বলা নিভু-নিভু আশায় বুক বেঁধে আমৃত্যু অপেক্ষা।

সাগরের টানে স্নেহভাজন সহকর্মীকে একটু বুঝিয়ে, আশ্রয়ে ফিরতে আমার দেরী হবে জানিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। পড়ন্ত বিকেলে একাকী সাগরতীরে দাঁড়িয়ে জীবনানুভব, অভাবিত পাওয়া। ও পাশের মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করবে জানিয়ে বিদায় নিয়েছে।

আমিও সাগরের দিকে দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছি। বেশ দূর গিয়ে পিছ-ফিরে তাকালাম। ও ততক্ষণে ওর পথে চলে গেছে। এক অজানা শঙ্কা সহসা মনে কাজ করছে। আত্মভোলা মন। আগে ভাবিনি, এখন ভাবছি।

সাগরের দিকে হাঁটছি। মনটা বার বার সেই একই আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে। সেল ফোনে ফোন করলাম, ফোন বন্ধ। ভাবছি, নিশ্চয়ই ফোন বন্ধ করে নামাজে দাঁড়িয়েছে। নিজের দায়িত্বহীনতার কথা ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি। আবার হাঁটছি, আনমনে ভাবছি।

আমার সাথে সে এখানে এসেছে। তার ভালোমন্দ দেখার ও ভাবার দায়িত্ব এখন আমার। সেই ছোটবেলা থেকে ওকে কাছে পেয়েছি। আমার সামনে ও ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছে, সংসার পেতেছে। ধর্মের দিকে কেন জানি সহসা বেশি ঝুঁকে পড়েছে। এসব বিষয় নিয়ে ওর সাথে অনেক বার

কথা হয়েছে। ইহজীবন ও পরজীবন নিয়ে আমার সাথে ওর মতদ্বৈধ আছে। আমি ইহজীবনের কর্মকে বেশি করে দেখি। ও ইহজীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করে, পরজীবনকে নিয়ে বেশি ভাবে, বড় করে দেখে।

ওর সমমনা আরো অনেক ছাত্রকে শিক্ষকতা জীবনে পেয়েছি। অসংখ্য ছাত্রের মাঝে ওর বিপরীত মতাবলম্বী পক্ষও পেয়েছি। নানা মতের, নানা বিশ্বাসের সবাইকে নিয়েই আমার শিক্ষকতা জীবন। সবাই আমার আপন। সবার চিন্তা-চেতনা, সুখ-দুঃখের কথা আমি শুনি, জানি— বোঝার চেষ্টা করি। ওদের সুখ-দুঃখকে ভাগ করে নিয়েই বেঁচে আছি। আমি ওদেরকে ভালোভাবে চলতে শেখাই। ওরা আমাকে বিশ্বাস করে ওদের অন্তরের কথাগুলো বলে।

বড় কষ্ট করে জীবনে ও আজ এ-পর্যন্ত এসেছে। আমার ভয়, রুমে ফিরে গিয়ে ওকে যদি আর খুঁজে না-পাই? ওর ফোনটা যদি বন্ধ থাকে? অনেক খোঁজাখুঁজির পর একদিন সকালে যদি কোনো বালির মধ্যে গুলিবিদ্ধ-নিষ্প্রাণ অবস্থায় ওকে অসহায়ভাবে পড়ে থাকতে দেখি! যদি পত্রিকার পাতায় ওকে নিয়ে গৎবাঁধা একটা খবর পড়ি, অথবা যদি আর কখনোই ওকে কোথাও খুঁজে না-পাই! তখন কাকে বলবো? কে ওর দায়িত্ব নেবে?

হয়তো রুমে গিয়ে রাতে ওকে ঠিকই পাব। তবু মনের মধ্যে অজানা ভয়। এ-ভয় সব সময় মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। 'আগুনে যার ঘর পুড়েছে, সিঁদুর-রাঙা মেঘ দেখে তার ভয়।'

ওরা আখেরাত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে বলে ইহকালে ওদের দায়িত্ব নেবার কেউ নেই। গণতন্ত্র কিংবা মানবাধিকার ওদের কথা বলে না, ওদের কথা ভাবে না। দোষ-নির্দোষ বিবেচনায় আসে না। ওদের জীবন বিপণ্ন হলে মানবাধিকার বিপণ্ন হয় না। ওদেরকে মারলে, কিংবা ওরা মরলে কোনো জবাবদিহিতা থাকে না। মানবিক অনুভূতিটা এভাবেই তৈরি হয়ে গেছে, কিংবা তৈরি করা হয়েছে। ওদের বিষয়টা এলে কেন-জানি আমরা সবাই বোবা হয়ে যাই। ওরা ভিনগ্রহের যাত্রী, পরকালের মধ্যে ওরা ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে, হয়তো তাই।

কিন্তু আমি ওকে ভুলি কী করে! আমি যে ওর শিক্ষক। ওর বিশ্বাসের জন্য, কৃতকর্মের জন্য ও কতটুকু দায়ী— ওর শিক্ষক হিসাবে বিচারালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমি নিজ কানে ওর জেরাটা একবার শুনতে চাই। সেক্ষেত্রে অন্তত মনে একটা সান্ত্বনা পাব। ও অপরাধী হলে ওর জেল-ফাঁস আমি মেনে নেব। আমি যে আস্তিক-নাস্তিক সবারই শিক্ষক, সবাই যে আমার আপন। কিন্তু বালির মধ্যে অসহায় হয়ে নির্বাক-মৃত আধা-বিবসন অবস্থায় পড়ে থাকলে, কিংবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে ওদের জেরাটা আমি শুনবো কেমন করে? ওদের শিক্ষক হিসাবে ওদের দোষ-গুণ শোনার অধিকার আমার আছে।

ওর পোশাক এবং বিশ্বাস আমার কাছে কোনো বিবেচনার বিষয় না। এ দেশের যে-কোনো একজন নাগরিককে সহসা একটা পক্ষ বিনা নোটিশে উঠিয়ে নিয়ে যাবে, কদিন পর কাউকে কাউকে গ্রেফতার দেখানো হবে, কেউ-বা অসহায় লাশ হয়ে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকবে, কেউ-বা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না— এমনটা আমার বিবেক কোনোভাবেই মেনে নেয় না। এ দেশের মানবকুলে জন্ম না-নিয়ে অন্য কোনো প্রাণিকুলে জন্ম নিলে হয়তো জীবনের এ নিরাপত্তাটুকু অন্তত থাকতো। এখন ‘জন্ম আমার ধন্য হলো, মাগো’ বলে তো আর নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারিনে। মনে অস্ফুট ব্যথা গুমরে মরে। এ থেকে পরিত্রাণের অপেক্ষা।

আনমনে কথাগুলো ভাবতেই গা-টা ভয়ে ছমছম করতে লাগলো। কেন-যে ওকে জোর করে ফিরিয়ে দিলাম! নিজেকে আবার ধিক্কার দিলাম। রুমে ফিরে গিয়ে ওকে ভালোভাবে পাবার অপেক্ষায় রইলাম।

সাগর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চিরনতুন সাগরের বালুময় বিস্তীর্ণ বেলাভূমির মধ্য দিয়ে আমি ধীরে ধীরে কূলের দিকে হাঁটছি। লক্ষ্য, সাগরের ধেয়ে-আসা অথৈ জলের ঢেউ ও কাদা-কাদা সিক্ত বালির মিলনরেখায় পৌঁছানো।

সুদূরের অজানা থেকে ফেনিল জলরাশির উচ্ছল ঢেউ পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ছে। দিনটা সময়ের ঢেউয়ে ভর করে ধীর গতিতে পিছনের দিকে ক্রমশ ভেসে চলে যাচ্ছে। দূরে, আরো দূরে তাকিয়ে আছি। সাগরের টলমলে ঢেউয়ের দোলায়

আমার জীবনডিঙিও যেন প্রকৃতির অগণিত ঘটনার তালে-তালে প্রতিক্ষণ উথাল-পাথাল ভাসছে। দূরে তাকিয়ে মনে ভাবের উদয় হচ্ছে—

> দিনগুলো আমার হারিয়ে গেল ঐ সুদূরের স্বপ্নলোকে
> ব্যথিত তাই আমার এ-হৃদয় হারানো সেই দিনের শোকে।

পিছনে ফেলে-আসা বালুময় বেলাভূমি, সামনে অথৈ জলরাশি। আমি মাঝে একাকী দাঁড়িয়ে। সূর্যের বিদায়রেখা দিগন্ত বরাবর প্রতিফলিত আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছে। আলোর নিস্তেজ রশ্মি আমার গায়ে এসে লাগছে। আমি যেন বিশাল তটভূমি পেরিয়ে জীবন-সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আজ অস্তগামী জীবন-সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছি। কী যেন এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন উদাসী মন।

সূর্যটা পশ্চিমের টানে ক্রশমই ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে যাবার তোড়জোড় করছে। সময়ের শেষে নিশ্চিতভাবেই আজকের মতো বিদায় নেবে। কিংবা ভেসে-আসা মেঘ তাকে আগেভাগেই ঢেকে দেবে। আগামী দিন পুব-দিগন্তে আবার সে ফিরে আসবে— এ প্রতিশ্রুতি ওর আছে। কিন্তু আমার কি আবার পিছু ফিরে আসা হবে! যে যায়, সে চিরদিনের জন্য যায়। ফিরে আর আসে-না কখনো। শুধু ভবিষ্যতে নতুনভাবে কিছু পাবার অপেক্ষা রেখে যায়।

সময় ও ঘটনার এ মাহেন্দ্রক্ষণেও আমি নতুন। সামনের প্রতিটি অজানা ঘটনা ও আবহমান সময়ের জন্য আমার আজন্ম অপেক্ষা। মহাসময় এবং মহাজীবনের প্রতিটি ঘটনায় প্রতিক্ষণে, সমাগত নতুনের প্রতিটি পরতে পরতে অভিনবত্বের ছোঁয়া। প্রতিনিয়ত নতুন ঘটনার সাজে নতুনের অভিষেক— নবীনবরণ। জীবন চিরনবীন, চিরনতুন। সদ্যমৃত অশীতিপর যে-বৃদ্ধ এইমাত্র কবরে এসে শুয়ে কাঁচা বাঁশের ডায়ামিটার মাপছে, সেখানেও সে আজ নতুন— তার আজ নবীনবরণ, নতুনের অভিযাত্রী। পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষমাণ।

অনতিদূরে হাঁটুপানির মধ্যে একটা শুকনো বাঁশ পোঁতা। তার মাথায় একটা মাছরাঙা পাখি বসে আছে। পানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মাঝেমধ্যেই পানিতে ছোঁ মারছে। ছোঁ-মারা তার অন্নসংস্থান। কী পেল, কী না-পেল, তা তার ভাবার সময় নেই। পেলেও পেতে পারে, না পেলেও ক্ষতি নেই। চলে যাবে

আবার নতুনের খোঁজে, উড়ে গিয়ে বসবে আবার কোনো পোঁতা বাঁশের মাথায়— অথবা চলে যাবে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। আমিও এভাবেই আজন্ম জনে জনে যাচি— খুঁজে ফিরি পথে পথে। পথ চলি পথের সন্ধানে। পেলেও পেতে পারি, না-পেলেও নেই ক্ষতি। চলে যাই আবার অন্য পথে, নতুন পথের বাঁকে। সময় ও ঘটনা আমাকে সামনে টেনে নিয়ে যায়। নতুনের আশায় নিয়ত অপেক্ষমাণ।

পিছনে ফিরে তাকালাম। দেখি, সাগরের বালুময় বেলাভূমিতে অসংখ্য পদচিহ্নের ভিড়ে— দূর থেকে হেঁটে-আসা আমার অগভীর পদরেখা, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান পর্যন্ত এসে থেমেছে। জীবনের এই পদপ্রান্তে এসে পিছনে ফেলে-আসা জীবন-সাগরের বিস্তীর্ণ তটভূমি জুড়ে অমলিন স্মৃতিরেখা হৃদয়পটে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমি তো সেই প্রথম দিনের আমি, আমি সজীব এহসান। আমি আমিই, আমার মধ্যে আমি সেই ছোট্ট 'সজীব'। চিরসজীব অবুঝ আমি, চির আমি— অনন্ত পথের নিরন্তর যাত্রী, নতুন পথের অপেক্ষায়।

দুই

কোন দীপ্ত উষা চোখ ভরে দিয়েছিল আলো— তা আজ আর মনে নেই। সেই থেকে অপেক্ষার পালা শুরু। জীবনটাই একটা আজন্ম প্রতীক্ষা। নিজের অজান্তেই কেঁদে উঠেছি— হয়তো ক্ষুধাসঞ্চারের প্রতীক্ষা। মা কাছে এলেই দুধের খিদে মিটেছে— তাই মায়ের জন্য অপেক্ষা। তারপর আবার কান্না শুরু— কখন মা আসবেন, সে অপেক্ষা। দুধের জন্য অপেক্ষা, ক্ষুধা নিরসনের অপেক্ষা।

দিনে দিনে অবুঝ থেকে কিছুটা বুঝ নিতে শিখেছি। একদিন বায়না ধরলাম ‘ভেড়ার চামড়ার বল’ কিনে দিতে হবে। গা লোমে ঢাকা, দেখতে লন-টেনিসের বলের মতো বল আমার দরকার। কবে-যে হাটবার আসবে! ওটা ছাড়া আমার আর চলছে না। অবশেষে হাটবার এলো। আব্বা হাটে গেলেন। বার বার করে বললাম, ‘আমার বল দরকার’। যে-কোনো প্লাস্টিকের বল না, ‘ভেড়ার চামড়ার বল’। উনি কথা দিলেন, আনবেন। সেই সকাল দশটা থেকে বিকেল অবধি বলের প্রতীক্ষায় আছি। বার বার রাস্তার ওদিকে যাচ্ছি, পথের দিকে তাকাচ্ছি। প্রতীক্ষা আমাকে বল দেবে।

উনি ফিরে আসার পরপরই বাজারের ব্যাগ ঘেঁটে দেখলাম, বল নেই। কৈফিয়তের অপেক্ষা না-করেই উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে কান্না। বিরাট উঠোন, বিশাল সংসার। মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। অনেক করে কাঁদলাম, কাঁদতে থাকলাম। মনে আশা, মা এসে একটু বুঝিয়ে বলে আদর করে কাছে নেবেন। বলবেন, “এ বাজারে ‘ভেড়ার চামড়ার বল’ পাওয়া যায় না। শহরে গেলে এনে দেবে।” মা-ও আসছেন না, আমার কান্নাও থামছে না। বার বার রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকাচ্ছি, আর কাঁদছি— মায়ের জন্য অপেক্ষা। কাঁদতে কাঁদতে অনেকক্ষণ পর— কখন জানি অন্য একটা খেলার দিকে মন চলে গেছে। কান্নাটা থেমে গেছে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম। মনে হলো, এই! আমি না কাঁদছিলাম! বিনা আদরে, বিনা তোষামোদে কান্নাটা থামিয়ে দিলাম! আবার কান্না শুরু। মনে হচ্ছে, মা না-হয় রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত বুঝলাম, কিন্তু এ-বাড়িতে আমাকে একটু আদর করে কান্না থামানোর কি কেউ নেই? কেউ একজন এগিয়ে এলেই তো

কান্নাটা থামাতে পারি। কেউ এগিয়ে এলো না— আমার কান্নাও নিরবধি চলতে থাকলো। মা রান্নাঘর থেকে কাজ শেষ করে কখন আসবেন, আমি তখন সে অপেক্ষায়। রান্নাঘরের কাজ শেষের অপেক্ষায়।

অবশেষে, ভরসন্ধেয় বড় বোন কোথা থেকে যেন এসে আমার কান্না থামালো। আমার সম্মান রক্ষা পেল। কিন্তু আব্বার শহরে গিয়ে বল এনে দেওয়ার অপেক্ষা রয়ে গেল। আর কতদিন! দিন যে আর যায় না! মনে ভাবনা, দিন যেতে যেতে আমি যদি বড় হয়ে যাই, তাহলে 'ভেড়ার চামড়ার বল' দিয়ে তো আর খেলা হবে না। বাড়ির অন্য সবাই কেন যে এটা বোঝে না!

ব্যাড়ের মধ্যে ডালিম গাছে ফুল ধরেছে। গাছটা কিশলয়ে ছেয়ে গেছে কী না-গেছে, ওদিকে তাকানোর সময় নেই। আমার শুধু ডালিম কবে বড় হবে, গায়ে লালচে রং ধরবে, তারপর অম্ল-মধুর রসে মুখ ভেজানোর প্রতীক্ষা।

বাড়ির পাশ দিয়ে গ্রামের রাস্তা। রাস্তার উল্টোদিকে সালামত চাচার বাড়ি। গ্রামে বাস করলেই সবাইকে কোনো-না-কোনো সম্পর্ক ধরে ডাকতে হয়। আপন কেউ না, তবু চাচা। চাচি আমাকে খুব স্নেহ করেন। চাচির মেজো ছেলে সেলিম ভাই— যদিও আমার চার বছরের বড়, তার সাথে আমার বড্ড মিল। আপন চাচাতো ভাইয়ের মতো। চাচি ঘরের পাশে শসার চারা লাগিয়েছেন। চারাটা কবে বড় হবে, মাচায় উঠবে, শসাগাছে কখন ফুল ধরবে— সেজন্য অপেক্ষা। চাচির হাতে-করে-দেয়া কচি শসা খাওয়ার অপেক্ষা।

সেলিম ভাইয়ের সাথে প্রায় প্রতিদিন বৈঠকখানায় বসে 'বত্রিশ গুটির বাঘবন্দি' খেলি, লুডু খেলি। একসাথে খেলার মাঠে যাই, খেলা করি। তাকে নিয়ে আরো কত খেলা করার আশা করি। দুজনের কেউই কাউকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে চাইনে। এ-নিয়ে বাড়িতে অনেক বকাও খাই। দুপুরে মা-বাপ ঘুমাতে বলেন। রোদের মধ্যে বাইরে যেতে নিষেধ করেন। কীভাবে ভরদুপুরে মা-বাপের চোখ ফাঁকি দিয়ে উন্মুক্ত মাঠে ঘুড়ি উড়াতে যাওয়া যায়, সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। দুপুরে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতীক্ষা।

সালামত চাচা সাদাসিধে দ্বীনদার মানুষ। ঝুট-ঝামেলায় থাকেন না। পরকাল নিয়েই তাঁর যত চিন্তা। মসজিদ আর বাড়ির মধ্যেই বেশি ঘোরাঘুরি। জোহরের নামাজের

পরই একটু সুখনিদ্রার অভ্যাস। আমরা সেই সুযোগটা নেয়ার অপেক্ষায়। দু-চোখ বুজে নাকের শব্দটা একটু ফসফস করলেই সেলিম ভাই ঘর থেকে বের হয়ে আসে। আমিও সালামত চাচার ঘুম ও সেলিম ভাইয়ের আসার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনি। কখনো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। রাস্তা পেরিয়ে সেলিম ভাইয়ের ঘরের জানালায় গিয়ে দূর থেকে উঁকি মারি। আগ থেকে ঠিক করা দুটো নির্ধারিত সুস্বাদু মাছের নাম আস্তে আস্তে অকস্মাৎ বলে উঠি, 'কই, না মাগুর?' 'কই' বললেই বুঝি, চাচা এখনও ঘুমাননি, আরো দেরী হবে। আবারো অপেক্ষা। 'মাগুর' বললেই বুঝি, উনি ঘুমিয়ে গেছেন। সেলিম ভাই এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে। তখন আবার অনুকূল ঝিরঝিরে বাতাসের জন্য অপেক্ষা। মনের আনন্দে ঘুড়ি ওড়ানোর অপেক্ষা।

কখনো মাঠে গিয়ে সেলিম ভাইসহ রাখালদের সাথে গরু চরাই। বিলের মরা শামুক কুড়ানোর খুব শখ– তা কুড়াই। তা দিয়ে রাখালদের সাথে খেলা করি। আবার বিলের কাদায় নড়ি পোতাপুতির খেলা করি। কার নড়ি কে তার নড়ি দিয়ে চাটি মেরে ফেলে দিতে পারে, তার প্রতিযোগিতা। গরু চরানোর ছলে খেলার জন্য মাঠে যাওয়া। রাখালদের সাথে নিয়ে কত বিচিত্র খেলা। কত খেলার আশা! সেলিম ভাইকে সাথে নিয়ে খেলার আশা। কখনো মাঠ থেকে সোজাসুজি খেলার মাঠে গিয়ে দুজনে হাজির হই। মা কোনো দুশ্চিন্তা করেন না, হারিয়ে যাওয়ার কোনো ভয়ও নেই। যত রাতই হোক বাড়িতে ফিরে আসি। সেলিম ভাই সাথে আছে, চিন্তা নেই।

মা মাঠে যেতে বারণ করেন। অনেকবার আশঙ্কা করেছেন, ছেলেটা শেষমেশ নিশ্চয়ই রাখাল হবে। মায়ের বর্তমানেই রাখাল আমি হয়েছি ঠিকই। সে-রাখাল পুব-মাঠে গরু চরানোর রাখাল না, বিদ্যাপীঠে ছাত্রছাত্রীদের রাখাল। মা সেই কবে ইহলীলা সাঙ্গ করেছেন। আমার জীবনে মাকে কোনোদিনই শান্তি দিতে পারিনি। মা আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না, জানি। তবু মন মানে না। মনের অজান্তেই ভুলো-মনে কিংবা আনমনে, কখনো স্বপ্নে মাকে দেখার অবুঝ অপেক্ষা।

বিশাল খোলা-বাড়ির চারপাশ ঘিরে খড়-বিচালির পালা, পাশে গোলাঘর, আমবাগান, গোয়ালঘর– এত সবের মাঝে ভরসন্ধেয় কিংবা সন্ধ্যার পরে আবছা-আবছা আলো-আঁধারে, কখনো চাঁদনী রাতে– নিজেকে লুকিয়ে রাখার অঢেল সুযোগ। সেখানে লুকোচুরির খেলা করি। পাড়ার সমবয়সী ছেলে,

রাখালদের নিয়ে লুকোচুরির খেলা, সাথে আছে সেলিম ভাই। নিজেকে হারিয়ে খোঁজা, খুঁজে আবার হারানো। কাউকে খুঁজে পেয়ে খিলখিল করে হাসা, প্রাণখোলা নির্মল হাসি। আবার খোঁজার অপেক্ষা। চিরদিনের জন্য হারানোর কোনো ভয় নেই, ক্ষণিক অপেক্ষা। ধুলো-মাটি-কাদায় গড়িয়ে গড়িয়ে গায়ে এ-মাটির গন্ধ। দোআঁশ মাটির গন্ধ শরীরের প্রতিটি অঙ্গে এমনভাবেই এঁটে গেছে যে, আজীবন সাবান ঘষেও এ-গন্ধ শরীর থেকে দূর করতে পারিনি। এ-গন্ধ নিয়েই কবরে যাবার অপেক্ষা। মাটির এ-বন্ধন মুক্ত হতে আজীবন অনেক চেষ্টা করেছি— কোনোভাবেই তা পারিনি। বাকি দিনগুলোতে হয়তো আর পারবোও না।

ধীরে ধীরে বড় হচ্ছি। মা-বাপ স্কুলে পাঠিয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছে, জীবনে আমি অনেক বড় হব। মা-বাপের অল্প পড়াশোনা, তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে দিয়ে পূরণ করতে চান। বই কিনে দিয়েছেন, স্কুলে যেতে হয়। চার ক্লাস আগের পড়া আজও মনে পড়ে :

> "খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
> বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?
> ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কী?
> আর ক'টা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি।"

যখন পড়েছি, মনে প্রশ্ন আসেনি, তাই প্রশ্ন করিনি। গ্রামের ছেলে, যদিও একটু বেশি বয়সে স্কুলে যাই। এখন মনে নানা প্রশ্ন, বর্গী কোথা থেকে আসে? দেশে বর্গী এলে কী হয়? বর্গী কারা? কেউ পথ চিনিয়ে না-আনলে কি তারা আসতে পারে? ধান-পান সবই তো ফুরিয়ে গেল, হাতের পাঁচ এখন রসুন। আচ্ছা, রসুনও যদি বুলবুলির মতো কোনো পাখিতে খেয়ে যায়, তখন কী হবে? দেখা যাক কী হয়। আবার সবুরের পালা। রসুনের জন্য খাজনাদাতা ও আদায়কারীকে সবুর করতে হবে। এ সবুর খাজনা আদায়কারীর রসুনের রসনা কিছুদিনের জন্য সংযত করার সবুর। খাজনাদাতার সর্বস্ব দিয়ে নিঃস্ব হবার সবুর।

আরো বড় হলে জেনেছি, অসংখ্য বর্গীর দল অতীতেও এ দেশে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও আসতে পারে। বর্গীদের থেকে সাবধান থাকতে হয়। তাদের সব ভালো কথা ভালো না-ও হতে পারে। বর্গী নামের নামবদল হতে পারে। যারা পথ

চিনিয়ে নিয়ে আসে, তারা এ দেশেরই লোক বা কোনো গোষ্ঠী। নিজেকে সবাই দেশের ত্রাতা বলে দাবি করে। সবকিছুই দেশের কল্যাণের নামে করে। এমনকি ত্রাতা দাবিকারী গোষ্ঠীরও পালাবদল হয়। শুনেছি, এসব অতীত জানার জন্য ইতিহাস পড়তে হয়, ভবিষ্যৎ ভাবার জন্য সুশিক্ষিত হতে হয়। দেখার জন্য 'আর ক'টা দিন সবুর' করতে হয়।

বিকেলে খেলার মাঠে সেলিম ভাইয়ের সাথে ফুটবল খেলতে যাওয়ার প্রবল বাতিক। দু-দলেই এগারোজন করে খেলোয়াড়। অনেকেই বলটা ঠিকমতো ধরতে জানে না— আমার অবস্থাও সেই রকম। মাঝেমধ্যে গোলপোস্ট পাহারার দায়িত্ব দিয়ে দেয়। আমিও তাতেই খুশি। নিজ দলের এগারোজন খেলোয়াড়ের মধ্যে সবাই যে ভালো খেলে তা নয়। বাকি দশজন খেলোয়াড়ের ভালো-মন্দ বাছ-বিচারের তুলনায়, কোন দল কয়টা গোল খেয়েছে, খেলা শেষে এটার হিসাবই সবার মুখে মুখে।

গোলপোস্টে পা-টা একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকি। বল আসতে দেখলে ধরার চেষ্টা করি। প্রায়ই বলটা গড়িয়ে দু-পায়ের মধ্য দিয়ে পার হয়ে গোলপোস্টের দিকে ক্রমশই গড়িয়ে চলে যায়। ধর ধর করতে করতে ততক্ষণে গোলপোস্টের প্রান্তরেখা পেরিয়ে বল চলে যায় দূরে। দর্শকদের সারি থেকে করতালি। অবশেষে, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। সমস্ত পরাজয়ের গ্লানি গোলকিপারের মাথায়, অর্থাৎ আমার মাথায় এসে নামে। অন্য খেলোয়াড় যত খারাপই খেলুক, গোল তো আর হয় না। গোলকিপার যদি যে-কোনো কৌশল ও দক্ষতা দেখিয়ে বলটা ঠেকিয়ে দিতে পারে, তাহলে গোলটা নিশ্চিত এড়িয়ে যাওয়া যায়। সবচে ভালো হয়, বলটা যদি গোলপোস্টের দিকে আদৌ না-আসে। এবার গোলপোস্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বল যেন আর না-আসে, সে অপেক্ষা।

ইয়াহিয়া আমাদের গ্রামেরই একজন মানুষ। বয়সে আমার তুলনায় অনেক বড়। চুলগুলো অকালপক্ক। ক্লান্তশ্রী, ফর্সা মুখখানা। চিন্তাধারায় অসম্ভব সরলতা। পুব-পশ্চিম বোধ নেই বললেই চলে। আমাদের মতো কিশোর এবং উঠতি-বয়সী যুবকদের সাথে চলতে ভালোবাসেন। চিরশ্যামল গাছের মতো স্বপ্রভায় সমুজ্জ্বল, চিরকুমার। অকালে বাপ-মাকে হারিয়েছেন। এক ভাই-ভাবীর বাড়িতে থাকেন। আরেক ভাই-ভাবী আছেন, অনেক মাইল দূরে। খেলার মাঠে সবার আগে আগে থাকেন। কোনোদিন স্কুলে গেছেন কি-না কারো জানা নেই। আমিও তাঁকে

কোনোদিন স্কুলে যেতে দেখিনি। সবসময় ফুল-প্যান্ট পরে একটা ডায়েরি হাতে নিয়ে কোথাও-না-কোথাও চলেছেন। ছাত্র পরিচয়ে কখনো বাসে ভাড়া লাগে না, কখনো-বা অগত্যা হাফ-ভাড়া দিয়েই পার। কলেজ-স্টুডেন্ট বলেই অধিকাংশ সময় চালিয়ে দেন।

খেলার মাঠে গিয়ে যে-কোনো দলের পক্ষে দাঁড়িয়ে যান। নিজের দলের গোলপোস্টের মধ্যে বল ঢুকলেও দর্শকদের সাথে তাল মিলিয়ে হাততালি দেন। হো-হো করে হাসেন। সে কী নির্মল হাসি! সারা মাঠ দৌড়িয়েও বলের নাগাল পান না। বলের পিছ পিছ দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাসেন। সুযোগমতো বল নিজের দলের গোলপোস্টের কাছাকাছি এলেও তার মধ্যে বল মেরে দিয়ে 'গোল! গোল!' বলে চিৎকার করে হাসেন। সে কী আনন্দ! অনাবিল আনন্দ। কোন পক্ষে গোল হলো সেদিকে খেয়াল নেই। গোল হলেই আনন্দ। নিজের হারজিতের জন্য খেলা না, গোল হবার প্রতীক্ষায় খেলা। আনন্দের জন্য খেলা। বিনোদনের জন্য খেলা। যেদিকেই হোক, গোল তো একটা হয়েছে! খেলা সার্থক হয়েছে, তাই আনন্দ।

মাঝেমধ্যেই হাতে-রাখা সেই ডায়েরিটা নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যান— আত্মীয়, দূরাত্মীয় কিংবা অনাত্মীয়ের ঠিকানায়। মাসের পর মাস নিরুদ্দেশ। তাঁর এই নিরুদ্দেশ নিয়ে কখনো কারো মধ্যে কোনো উদ্বিগ্নতা নেই– নিরুদ্বেগ ভাব। সবাই জানে তিনি কোথাও-না-কোথাও আছেন। সময় হলেই নিশ্চয়ই চলে আসবেন। সবাই তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায়।

আবার কোনো একদিন হঠাৎ গ্রামে এসে হাজির। কানে বেশ কম শোনেন। ভাই-ভাবী 'এহিয়া' বলে ডাকেন। গ্রামের আর সবাই একনামে 'হিয়া-কালা' বলেই ডাকে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি বলে পুরো নাম অক্ষত রাখতে পারেননি— নামের বিকৃতি ঘটেছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে খেলার মাঠ জমে না। কোথায় যেন একটা নির্মল আনন্দের ছন্দপতন সবাই অনুভব করে। অনেক বছর ধরে গ্রামের প্রতিটি আনন্দঘন ঘটনায়, রসময় আসরে 'হিয়া-কালা'র নিসাড় শূন্যতা। সবার 'হিয়া-কালা' কালগর্ভে কোথায় যে একদিন হারিয়ে গেলেন, আজ অবধি মনে মনে তাঁর জন্য অপেক্ষা। মনে সান্ত্বনা এটুকুই, নিশ্চয়ই তাঁর কোথাও কোনো অপমৃত্যু হয়নি। পরে শোনা গিয়েছিল, দূরে কোনো-এক আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গিয়েছিলেন।

তিন

কিশোর বয়স। হাইস্কুলের মধ্যভাগে পড়া এক সাধারণ ছাত্র। ক্লাসে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সারির বেঞ্চে বসি। সুযোগ পেলেই ক্লাস থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী বাজারের ভিতর গিয়ে ইয়ার-বন্ধুদের সাথে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা খেলা করি। স্কুল ছুটির সময় হলেই বাড়ির পথ ধরি। উচ্ছন্নে যাবার উপযুক্ত বয়স। কোনো একটা অজুহাত পেলেই ক্লাস ছাড়তে প্রস্তুত।

ছাত্রনেতারা প্রায়ই মিটিংয়ে নিয়ে যায়। নাম দিয়েছে ছাত্র সমাবেশ। কড়ইতলায় ছাত্র জমায়েত। নেতৃত্বে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের বক্তৃতা শুনি। আইয়ুব খানের পতনের আন্দোলন।

বড় নেতা হতে কোনোদিনও চাইনি, পারিওনি। 'নেতৃত্বের গুণাবলি' পড়ে দেখেছি, ওগুলো আমার মধ্যে নেই। 'নেতা হবার শত কৌশল' বই কিনেও কখনো পড়িনি। বরাবরই মুখচোরা গোছের, অন্তর্মুখী অনুভূতি নিয়ে পিছ-পিছ চলা কল্পনাপ্রবণ মানুষ আমি।

কড়ইতলায় বক্তৃতা শোনা দিয়েই শুরু। দু-বছরের মধ্যে একটা জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন ও বৃহৎ ইতিহাসের কালসাক্ষী হয়ে গেলাম আমি। এ কথা তখন ভাবিনি, বুঝিওনি। এখন ভাবলে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করি। ইতিহাসের মূল অধ্যায় আমি নিজ চোখে দেখেছি। প্রেক্ষাপট কিছুটা দেখেছি, অনেকটা প্রবীণদের গল্পে শুনেছি, বাকিটা বই পড়ে জেনেছি।

বক্তৃতার মধ্যে অনেক কিছু উঠে আসে। বঙ্গভঙ্গ, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম, দ্বিজাতিতত্ত্ব, লাহোর প্রস্তাব, স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন, পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনা, মৌলিক গণতন্ত্র, ছয় দফা, আরো কত কী! বক্তৃতা শুনে শুনে ঘটনাগুলো মুখস্ত হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যেই 'গাড়ির চাকা ঘুরবে না, দোকানপাট খুলবে না' বলে হরতালের ডাক দেয়া। এভাবেই চলতে থাকে। একদিন শুনলাম, আইয়ুব খানের পতন হয়েছে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। কোথায় হয়েছে, কীভাবে হয়েছে, জানিনে। শুনলাম, ইয়াহিয়া খানের কাছে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

আমি ক্রমশ উপরের ক্লাসে উঠছি। ইয়াহিয়া খান দেশের সাধারণ নির্বাচন দিলেন, সত্তরের নির্বাচন। পূর্ব পাকিস্তানের জনোচ্ছ্বাস তুঙ্গে উঠলো। আবার ছাত্র-সমাবেশ— মিটিং, মিছিল। নেতাদের পিছ-পিছ মিটিং-মিছিলে যাই। কোরাস ধরে মিছিল করি, বক্তৃতা শুনি, রক্ত গরম হয়। বড় কিছু বুঝিনে, ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই এ দেশ শোষিত এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এটুকু বুঝে এসেছে।

আমার ক্লাসের পুস্তক ভাণ্ডার থেকে ইতিহাস জানার দৌড় ও বিশ্লেষণ স্বল্পকায়— বাংলার প্রাচীন জনপদ, প্রাচীন যুগ, মৌর্য বংশ, আর্যদের আগমন, বৌদ্ধধর্মের প্রসার, পাল বংশ, সুলতানি আমল, মোগল আমল, ব্রিটিশ শাসন আর পাকিস্তানি শাসন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ এবং ক্লাসের বাইরের কিছু বই পড়ে জানার পরিধি বেড়েছে, দেশ-চিন্তা ও বিশ্লেষণের ধরন বিকশিত হয়েছে।

জেনেছি, বর্তমান এ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমি সুদূর-বিস্তৃত ও জাতিসত্তার মূলে প্রোথিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙালির ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজকের বাংলাদেশ ও বাঙালির শেকড় সন্ধানে যেতে গেলে শুধু ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করলে হবে না, হবে না ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু করলেও। যেতে হবে আরো পিছনে— অনেক গভীরে। ভারতবর্ষের ইতিহাস এ-দেশের সচেতন জনগোষ্ঠীকে অনেক পিছনে হাতছানি দিয়ে ডাকে, ফিরে তাকাতে বলে। ইতিহাস অনেক অপ্রিয় কথাও বলে। স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এগুলোর কিঞ্চিৎ আলোকপাত এখানে প্রাসঙ্গিক।

ইতিহাস বলে, বর্তমান ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চিন্তা, চেতনা ও মানসিকতার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আর্যরা মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসে প্রথমত স্থানীয় দ্রাবিড়দের পরাজিত করে তাদের শাসন কায়েম করে। তারপর ক্রমশ ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। আর্যরা বহিরাগত হলেও সে-সময়ে ভারতবর্ষে বসবাসরত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসের সাথে তাদের ধর্মবিশ্বাসের একটা মিল পাওয়া যায়। তারা উভয়ই ছিল বহুত্ববাদী-শক্তিপূজক। তারা আর্য-অনার্য, জাত-পাতের প্রভেদ তৈরি করে।

পরবর্তীকালে আফগানিস্তান থেকে প্রথমে সুলতানরা এবং পরে মোগলরা ভারতবর্ষে এসে তাদের শাসন কায়েম করে। সুলতান এবং মোগলরা এ দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য না-এলেও, তাদের সাহচর্যে সুফি ও ধর্ম-প্রচারকদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে। একদিকে সে-সময়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক বঞ্চনা, নিগ্রহ, ছুত-অচ্ছুত জাত-পাতের বিভেদ এবং অন্যদিকে একেশ্বরবাদী মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যের নীতির কারণেই ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। যদিও কবিতার ভাষায় 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন— শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন' বলে স্বীকার করা হয়েছে, তবু বহিরাগত আর্যরা বহিরাগত মুসলিম শাসনকে কোনোদিনই ভালো চোখে দেখেনি। তারা বরং সব সময়ই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা করতে ও বিদ্বেষ ছড়াতে শিখিয়েছে। ফলে দেব-দেবীপূজক জনগোষ্ঠী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনের পতন হলে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই এ দেশের বঞ্চনার প্রেক্ষাপট দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক পুরো ভারতবর্ষ শাসন, শোষণ ও নির্যাতন এবং ব্রিটিশ শাসকদের আনুকূল্যে হিন্দু-সমাজপতিদের অনগ্রসর মুসলমানদেরকে শাসন, শোষণ, নিগ্রহ ও নির্যাতন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায়। সে যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের রসদ ও অর্থের সংস্থান গোপনে করেছিল 'জগৎশেঠ' নামের এক ভারতীয় ব্যবসায়ী। তার আসল নাম 'ফতেহ চাঁদ', পিতা মানিক চাঁদ, দাদা হিরেন্দু সাহু। জানা যায়, ১৬৬০ সালের দিকে তার পরিবার রাজস্থান থেকে পাটনায় আসে। ফতেহ চাঁদ যখন তার বাবার উত্তরাধিকার হয়ে ক্ষমতায় বসে, তখন 'জগৎশেঠ' উপাধি ধারণ করে। পাটনা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকায় ব্যবসার প্রসার ঘটায়। কথিত আছে, জগৎশেঠের অর্থের পরিমাণ তৎকালীন ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের তুলনায় বেশি ছিল।

তথ্য পাওয়া যায়, নবাবের সৈন্য এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে পলাশীর প্রান্তরে যখন যুদ্ধ চলছিল, অসংখ্য চাষি ও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী নিকটেই ঢিপির উপর বসে সে-যুদ্ধ উপভোগ করছিল। যদি উপবিষ্ট চাষি ও গ্রামবাসীরা মাঠ থেকে কুড়িয়ে প্রতিজন একটা করে ঢিলও ব্রিটিশ সৈন্যদের ও বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলীর

দিকে ছুড়ে মারতো, তাহলে ব্রিটিশ সৈন্যরা নিশ্চিত পরাজিত হতো। ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি এ দেশীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা শক্তির এ প্রচ্ছন্ন সমর্থনের প্রমাণ পুরো ব্রিটিশ শাসনামল ধরে এবং অবিভক্ত ভারত বিভক্তিতেও পাওয়া যায়। তাছাড়া, ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যতগুলো বিদ্রোহ হয়েছিল, তার অধিকাংশই হয়েছিল মুসলমানদের নেতৃত্বে।

ব্রিটিশ শাসনও ভারতবর্ষকে কম শোষণ করেনি। ১৭৫০-এর দশকে সারা বিশ্বের উৎপাদনের শতকরা ২৬ ভাগ ছিল ভারতবর্ষের। আর যখন ব্রিটিশরা এ দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ ভাগ।

ভারতবর্ষের জাতসৃষ্টির গভীরে গেলে বোঝা যায়, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদাভেদ-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্ববাদের কারণে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম প্রসার লাভ করেছে। নিগৃহীত বৌদ্ধসমাজ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে স্থান করে নিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে। নিগ্রহ এবং বঞ্চনা নিরসনে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রেণীবৈষম্য-সর্বস্ব হিন্দুয়ানি কর্তৃত্ববাদের অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত হতে থাকলে এ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য অজান্তেই মন বিকল্প পথের সন্ধান করে। এটাই প্রকৃতির নির্ধারিত শিক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক অপরিহার্যতা। এ কারণেই পাকিস্তানের অভ্যুদয় ছিল শ্রেণী-বৈষম্যবাদের প্রতিভূ আর্যধর্মের একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারকারী সমাজব্যবস্থায় বঞ্চিতদের পৃথককরণ।

বর্তমান ভারতের সমাজব্যবস্থায় এখনো চোখ রাখলে অতীত ধর্মবৈষম্য, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, শ্রেণীবৈষম্যের বর্তমান রূপ কালসাক্ষী হিসাবে খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মনিরপেক্ষ(?), অসাম্প্রদায়িক(?) ভারতে ধর্মীয় বিভেদ এখনো প্রকট। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশের জনপ্রতিনিধিত্বকারী মুখ্যমন্ত্রী— অসংখ্য মুসলিম হত্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, ধর্মীয় স্থানে হামলার হোতা— প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে ‘সূর্য নমস্কারের বিরোধিতাকারীদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত’ বলে আহ্বান জানাচ্ছে এবং এ পুঁজি ব্যবহার করে জনগণের ভোটে নির্বাচিতও হচ্ছে।

আমরা যতই উদারতার দৃষ্টিতে তাকাই না কেন, এ ধরনের বিবৃতি ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সেখানকার বিদ্যমান সমাজের প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অবিমৃষ্যকারী মনোভাবের প্রমাণ মেলে। জনপ্রতিনিধিদের এসব খোলামেলা বক্তব্যে সে দেশে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব যে কতটা প্রকট, তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া সে-দেশে শত শত বছর ধরে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী জন্ম ও বংশপরম্পরায় কতটা অবাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেজন্য তারা এখনো নিজ দেশে পরদেশী। ভারতের আবহমান প্রতিহিংসাপরায়ণ-স্বার্থবাদী চাণক্যনীতির কারণেই প্রতিবেশী দেশগুলোর যে-কোনো সচেতন সাধারণ মানুষ এখনো ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ ও তাদের নেতৃত্বের হীন-মানসিকতাকে ভালো চোখে দেখতে নারাজ। এ-কারণেই উদার মানসিকতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী সম্মান বাঁচিয়ে ক্রমশই দূরে সরে চলে যাচ্ছে। কখনো কেউ প্রতিবাদী হতে গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এটা তাদের মনোজাগতিক বাস্তবতা। 'হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে, কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।'

তাই বলা যায়, শুধু পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ নয়, ভারতবর্ষের শাশ্বত বঞ্চনা ও ধর্মবৈষম্যবাদ— প্রথমে পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা' তত্ত্বের বাস্তব কোনো প্রয়োগ কার্যত সেখানে নেই। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকতাবাদ, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ধর্মীয় উন্মাদনা প্রগতির অন্তরায় এবং ভারতের উন্নতির পথে এখনো একটা বড় বাধা।

অতীতের এসব বৈষম্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের নিখাদ বাস্তবতা। এ বাস্তবতাকে বুঝতে হলে তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ছোট-বড় ঘটনাকে খোলা মন নিয়ে অনুভব করতে হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ এমনই ছোট-বড় অনেক ঘটনার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ফোরামে বৈষম্যের লুকিয়ে থাকা বীজের কিছু কিছু অঙ্কুরদ্গম হয়েছিল। সেখানে ছিল অবহেলিত, নিগৃহীত ও বঞ্চিত বাঙালি মুসলিম সমাজের মুক্তির অপেক্ষা।

ইতিহাসখ্যাত ঘটনার বাইরেও আমার পূর্বসূরিদের মুখ থেকে শোনা একটা পারিবারিক ঘটনা আজো মনে পড়ে।

নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বাড়ির মধ্যে গরু কোরবানি করা হয়েছে। কিছু পরিত্যক্ত হাড়গোড় বাড়ির পাশের গর্তে ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে। সেখান থেকে একটা হাড় কুকুর মুখে করে বেশ দূরে একটা জমিতে নিয়ে মনের সুখে বসে চেটেছে। সেটা ছিল এক হিন্দু কায়স্থের বর্গা দেয়া জমি– চাষাবাদ করেন এক 'নেড়ে'(?) মুসলমান। কেন একজন কায়স্থের জমিতে গরুর হাড় পড়ে আছে– এটাই মূল জিজ্ঞাসা। হাড়টা কোথা থেকে এসেছে, তার কারণ উদ্ঘাটনে ও অপরাধ বিচারের জন্য 'ব্রিটিশ ত্রাণকর্তা'দের কাছে নালিশ ও সদলবলে কোরবানিদাতার উপর অমানুষিক অত্যাচার চলতে থাকে।

এমন হাজার হাজার অজ্ঞাত, অকথিত ঘটনার প্রেক্ষাপটে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব। এগুলোকে অস্বীকার করতে গেলে নিজের অস্তিত্বই অস্বীকার করতে হয়। তবে নেতৃত্বের পরিবর্তনে রাজনৈতিক ও সামাজিক মনোভাব ও আদর্শের বদল হয়। আর ক্ষমতালোভী সুবিধাবাদী চরিত্রের অপরিণামদর্শী ব্যক্তিত্ব নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে এলে তো সোনায় সোহাগা, ইতিহাস বদলে দিতে চায়।

ইতিহাস বলে, ভারতবর্ষে জাত-পাত বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে একটা বৃহৎ উদারনৈতিক রাষ্ট্র গঠন করা যেত। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম-বর্ণ বৈষম্যবাদ, ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান বানানোর সুদূরপ্রসারী নীতি এক দেশ গঠনের অন্তরায় হয়েছে। এ নীতির কারণেই ভারতবর্ষ আজ বহুধাবিভক্ত এবং এখনো পর্যন্ত ভারতে নিত্য-নৈমিত্তিক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অব্যাহত। মৌল-হিন্দুত্ববাদী দলের নামে সেখানে আজো জনপ্রতিনিধি ক্ষমতায় বসছে, অথচ অন্য ধর্মবিদ্বেষী, ধর্মাশ্রিত নির্বাচিত প্রতিনিধি আজকের বাংলাদেশে বিরল।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সময়ই যদি পৃথক তিনটি রাষ্ট্র গঠন হয়ে যেত, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে বাংলা প্রথমেই মুক্তি পেয়ে যেত। তখন নিশ্চয়ই বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে একটা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতো। সেখানে সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে, সকল ধর্মের সমান অধিকারভিত্তিক একটা রাষ্ট্রকাঠামো দাঁড় করানো হয়তো যেত। কিন্তু তা হয়নি। পূর্ব বাংলার অংশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বেশ কিছু অংশ কেটে নেয়া হলো, এবং দেড় হাজার মাইল দূরের একটা ভূখণ্ডের সাথে বাংলার একাংশকে জুড়ে দেয়া

হলো। পুরাটারই নাম পাকিস্তান। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ এভাবেই সবার অজান্তে সে-সময়ই প্রোথিত হলো। তখনই অবশ্য অনেক দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এত দূরের দুটো অংশ শুধু ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বেশিদিন চলতে পারবে না। তখন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন হওয়া সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র।

এটা ছিল ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তবে বাংলাদেশের আজ সৌভাগ্যই বলতে হবে, পাশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তান নামের এ-অংশকে জুড়ে দেয়া হয়েছিল বলেই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার তেইশ বছরের মধ্যেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ করে দেশ আজ একটা স্বাধীন ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। নইলে বাঙালির শোষণমুক্ত, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের চেতনা সুদূরপরাহত রয়ে যেত। এটাই ইতিহাসের বাস্তবতা। যে বাস্তবতা বুঝতে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ভুল করেছিল। তারা একটা অযাচিত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে, গণহত্যা চালিয়েও বাঙালিকে থামিয়ে দিতে পারেনি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিল— আর সে ভুলের সুবিধাটা ভারত নিয়েছিল। ভারত সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। যদি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর যথাসময়ে শুভবুদ্ধির উদয় হতো, আলোচনার ভিত্তিতে এ-দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হতো, সেক্ষেত্রে, পারস্পরিক সম্পর্কটা অন্তত ভালো থাকতো এবং এ বিষয়ে ভারত বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে কোনো সুবিধার ফসল ঘরে তুলতে পারতো না।

কড়ইতলায় পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনা নিয়ে ছাত্রনেতারা অনেক কথাই বলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। সুযোগ-সুবিধায় দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা মুসলিম জাতীয় উম্মাহর কথা বলে বঞ্চনাকে উপেক্ষা করছে— কথাগুলো স্থানীয় নেতারা আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেন। অল্প বয়স, অল্প কথাতেই রক্ত গরম হয়। নেতাদের সাথে সাথে স্লোগান হাঁকি, বাড়ি চলে আসি।

কেন্দ্র থেকে বড় নেতারা এলে তাঁদের মিটিংয়েও যাই। বক্তৃতা শুনতে খুব ভালো লাগে। তাঁরা মনের কথাগুলোই বলেন। অগ্নিঝরা বক্তব্য দেন, শুনি। কোনো

একজন শিল্পী উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে শোনান— ‘আমার বাংলাবাসী ভাই, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই’। কিংবা ‘আমার বাংলাবাসী ভাই, চিরকাল আর চোখ বুজে ভাই থাকা উচিত নয়...।’ কোনো কোনো নেতা পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরেন। আমরা বোঝার চেষ্টা করি। ক্ষোভ বাড়ে, শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণাও বাড়ে।

আমাদের গ্রামের নিরক্ষর দিনমজুর ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই রাজনৈতিক দলাদলি, স্বাধীনতা-পরাধীনতা বুঝতেন না। তাঁরা বুঝতেন, নৌকা মার্কায় ভোট দিলে চালের দাম কমবে, তাঁরা হাফ-লুঙি পরে জীবন কাটাচ্ছেন, পশ্চিমা শাসন বন্ধ হলে পুরো-লুঙি পরতে পারবেন। আমাদের গ্রামের আরো শত শত উদ্যমী ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম করিম নানা। তিনি বুঝতেন, তাঁর আর বার বার জমি বিক্রি করে ঘোড়ার গাড়ি কিনে, কিছুদিন পর আবার তা বিক্রি করে ক্রমশ নিঃস্ব হতে হবে না। জমিগুলো তাঁরই থাকবে। জমির খাজনা দেয়া লাগবে না। পাঁচ মেয়ে, দুই ছেলেকে ভরপেট খাওয়াতে পারবেন, মেয়েগুলোকে ভালোভাবে বিয়ে দিতে পারবেন। অনেক প্রান্তিক চাষির ধারণা ছিল, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আর আকাল হবে না। সেজন্য পশ্চিমা খানদের তাড়ানোর অপেক্ষা। নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার অপেক্ষা।

স্বাধীনতা শব্দটা কাগজে কলমে আনুষ্ঠানিকভাবে পরে এসেছে সত্য, কিন্তু শব্দটা নির্বাচনের আগেই বিভিন্ন লোকের মুখে বার বার উচ্চারিত হতে শুনেছি। নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার গণজাগরণের মূলমন্ত্রই ছিল স্বাধীনতা।

আইয়ুব খানের পতনের আগে প্রায়ই হরতাল ডাকা হতো। অন্যদের মতো করিম নানাও ঐ দিনগুলোতে কোনোমতেই জমিতে লাঙল দিতে যেতেন না। যদি বলতাম, ‘নানা, আজ জমিতে লাঙল দিতে যাবে না?’ সরাসরি উত্তর দিতেন, ‘না, আজ হরতাল করবো।’ ঐ নিভৃত অজ-পাড়াগাঁয়ের এক মাঠের জমিতে লাঙল দিতে যাওয়া না-যাওয়ার উপর দেড় হাজার মাইল দূরে গদিতে বসে থাকা আইয়ুব খানের গদি নড়াচড়া যে কোনোভাবেই নির্ভর করে না, তা হয়তো করিম নানা বুঝতেন না। তাঁর ঐ অবুঝ ত্যাগ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অকুণ্ঠ দেশপ্রেম টাকার অংকে পরিমাপ করা কখনই সম্ভব না— তা বিবেক দিয়ে অনুভব করার বিষয়, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির বিষয়। করিম নানা, ফটিক ভাই, কাঙালি ভাইয়ের মতো হাজার হাজার

নিরীহ লোক রাজনৈতিক দল বুঝতেন না, কুটিলতা বুঝতেন না। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশ শোষণ করছে, চালের দামে পার্থক্য, চিনির দামে পার্থক্য, দিস্তাপ্রতি কাগজের দামে পার্থক্য— বক্তৃতা শুনে শুনে এটা বুঝতেন। নৌকা মার্কায় ভোট দিলে এগুলো থেকে মুক্তি পাবেন, এটা বুঝতেন। সকাল-সন্ধ্যায় গ্রামের রাস্তায় ত্রিমোহনীতে বসে হাত নেড়ে নেড়ে এ দেশের বঞ্চনার কথা উপস্থিত গ্রামবাসীকে বলতেন। মানুষকে উৎসাহ দিতেন, গল্পে মানুষ মাতাতেন।

নির্বাচনের উদ্দীপনায়, ভবিষ্যৎ স্বপ্নে, মিটিংয়ে মিছিলে, পূর্ব পাকিস্তানে গণজোয়ার বয়ে গেল। বাঙালি জেগে উঠলো। পূর্ব পাকিস্তানে এ দেশকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল বিপুল ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। মানুষ নৌকা মার্কায় ভোট দিল। এমনকি যতদূর মনে পড়ে, পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা আটানব্বই ভাগ ভোট নৌকা মার্কা অর্জন করলো। এই গণজোয়ারেও কাউকে কোনো ভোটকেন্দ্রে সবার সামনে ভোট দিতে দেখা গেল না। যার যার ভোট সে সে-ই দিল। সবাই গোপন ব্যালটে গোপনেই ভোট দিল।

ক্ষমতার পালাবদলে দরকষাকষি শুরু হয়ে গেল। গণজাগরণের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুক্তিপাগল মানুষ মুক্তির পিপাসায় ছটফট করতে লাগলো। পরিণামে উদাত্ত আহ্বান এলো, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ আহ্বান শুধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বান নয়, আগে থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত— আপামর গণমানুষের হৃদয়ের আহ্বান। সাধারণ মানুষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। আমাদের পাশের গ্রামের আজিবর ভাই লাঠি খেলার সর্দার। তিনি লাঠির কসরত দেখান। আজিবর ভাই দলবলসহ লাঠি নিয়ে প্রস্তুত। মাঝেমধ্যেই জনসমক্ষে পশ্চিমা খান তাড়ানোর জন্য লাঠি নিয়ে পাঁয়তারা করেন। মানুষ এতে উৎসাহ পায়। গ্রামের সহজ সরল সাধারণ মানুষের এ-এক সংগ্রামের উৎসব।

শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করতে টালবাহানা শুরু করে দিল। জুলফিকার আলী ভুট্টোকে মাঝে রেখে এ দেশের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ চলতে থাকলো। ভোটের মাধ্যমে দেয়া গণরায় উপেক্ষিত হলো। গণতন্ত্র পদদলিত হলো। ক্রমশই

চারদিকে গুমোট পরিবেশ, থমথমে অবস্থা দেখা দিল। আমার ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই, আজগর ভাই, করিম নানা গং তখন একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন, আর একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতাকি করছেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মোকাবিলার অপেক্ষায় নেতাদের মুখের দিকে চেয়ে শঙ্কিত মনে দিন গুনছেন।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনারা অতর্কিতে বাঙালি ইপিআর, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সাধারণ মানুষের উপর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অস্ত্রের ভাষায় নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার প্রতিশোধ নিতে লাগলো। গণহত্যা শুরু হয়ে গেল। বিনা উস্কানিতে নিজ দেশের সেনাবাহিনীর এহেন বর্বর আচরণ ও হত্যাযজ্ঞ ইতিহাসে বিরল। দেশের কোথাও কোথাও বাঙালি সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ সদস্যরা প্রতিরোধ গড়ে তুললো।

গ্রামে আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছায় অনেক পরে। রেডিওই শেষ ভরসা, যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ। লোকমুখে সঠিক তথ্যের চেয়ে গুজব বেশি। বিবিসির সান্ধ্য সংবাদ শেষ অবলম্বন। লোকমুখে শোনা গেল, শেখ মুজিব পশ্চিমা সেনাবাহিনীর কাছে ধরা পড়েছেন। কেউ কেউ বললেন, তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেকে বললেন, ২৫শে মার্চের হত্যাযজ্ঞের পরও উনি কেন যে বাসায় ছিলেন, ভাবতে অবাক লাগে।

লোকজন পালাতে শুরু করলো— শহর থেকে গ্রামে। সচেতন অনেকেই, ছোট-বড় নেতারা দিনে দিনে সুযোগমতো গ্রাম থেকে ভারতে। ভারত কার্যত বর্ডার খুলে দিল। ভারত সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হলো, প্রবাসী সরকার গঠিত হলো। ঘোষণায় তিনটি বিষয়কে স্বাধীনতার লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হলো: সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। অস্থায়ী প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণেও সাম্য, ন্যায়বিচার আর শোষণ থেকে মুক্তিকে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করা হলো।

জনপ্রতিরোধ ক্রমশ গেরিলা যুদ্ধে রূপ নিল। বাঙালি সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ সদস্য অংশ নিল। সাধারণ যুবক থেকে শুরু করে আধা-বয়সীরা পর্যন্ত দল-মত নির্বিশেষে অস্ত্রের ট্রেনিং নিল। যুদ্ধ চলতে থাকলো। শতকরা আটানব্বই

ভাগ জনগোষ্ঠীর হৃদয় নিংড়ানো চাওয়া, নিরঙ্কুশ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা যুদ্ধের প্রধান সহায়ক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হলো। এ-যুদ্ধে ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই, আজিবর ভাই, করিম নানা গংই পশ্চিমা অপশক্তি তাড়ানোর প্রত্যয়ে প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করতে লাগলো।

তাই এ-দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও যুদ্ধকে রাজনৈতিক দলগতভাবে দেখার কোনো অবকাশ নেই। কোনো রাজনৈতিক দল এ-যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে, তা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি ধর্ম-বর্ণ ও দল-মত নির্বিশেষে আপামর জনগোষ্ঠীর প্রাণপণ সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতাকে খাটো করে দেখলে তা হবে একদেশদর্শিতা। সে সময়ে এ-দেশের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দল বুঝতো না, তারা ছিল অধিকার সচেতন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক জোট। শতকরা এক-দুই ভাগ বিরোধিতাকারী এবং ভিন্নমত পোষণকারী সে সময়েও ছিল, এখনও আছে। যুগে যুগে প্রতিটা দেশের মুক্তির সংগ্রামে তাদের অস্তিত্ব থাকে।

গোটা মুক্তিযুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ, বঞ্চনা ও আধিপত্যের হাত থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে। এ দেশের মানুষ পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থনে ১৯৪৬ সালে নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশবাসী চেয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতরেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আজকের বাংলাদেশের সার্বিক সমস্যার সমাধান। ১৯৬৬ সালের ছয়-দফার ভিত্তি ছিল লাহোর প্রস্তাব। অবশেষে স্বাধীনতার মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রাম। এ সংগ্রাম মানুষের মর্যাদা, সাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের গণজাগরণের নির্বাচন পর্যন্ত ২৩ বছরে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বঞ্চনার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর মনে যে গ্লানি ও ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল, এ দেশের গণমানুষের মধ্যে যে দেশ-সচেতন উদ্দীপনা ও সংগ্রামী চেতনা জেগেছিল, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কোনো কারণে স্বাধীন হতে না-পারলেও, মাত্র কয়েক

বছরের মধ্যেই দেশের স্বাধীনতা অর্জন যে ছিল অবশ্যম্ভাবী ও সময়ের ব্যাপার মাত্র, তা নির্দ্বিধায় বলা য়ায়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়া ছিল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অপরিণামদর্শী দমননীতি ও হঠকারী সিদ্ধান্তের চাপিয়ে-দেয়া যুদ্ধের ফল। ভারত সরকারও যে পূর্ব পাকিস্তানের মতো কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূখণ্ডকে এত সহজে বাংলাদেশ নামের একটা স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে— তা ছিল তাদের কাছে অভাবিত।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে এ-কথা অনস্বীকার্য। তবে একটু গভীরে গেলে দেখা যায়, এতে ভারত সরকারের সুদূরপ্রসারী স্বার্থ নিহিত ছিল। স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের চলমান বাস্তব-অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেই স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন বন্ধুর সে-স্বার্থ ও শোষণের কালিমামাখা সুবিধাবাদী দিকগুলো উন্মোচিত হয়ে ওঠে। বর্তমান কৃত্রিম-সভ্যতার যুগে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে অসভ্যভাবে দেশ আর কেউ দখল করে না। বিকল্পে, অনুগত সম্প্রদায় তৈরি করে সে-দেশের রাজনীতি এবং অর্থনীতির কর্তৃত্ব কৌশলে দখল করে রক্ত শুষে নিতে থকে। বন্ধুদেশ ভারত এ দেশের রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অভিন্ন নদীর পানি, ট্রানজিট সুবিধা, কৌশলগত প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছে। এ দেশে কর্তাভজা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে। এ দেশ ইতোমধ্যেই ভারতীয় অসম ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তির ব্যবহার, চাকরি ও পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। এ-ছাড়া রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পুরাদমে অব্যাহত আছে। লক্ষ্য, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণ।

চার

অনেক রক্ত, ভাই-মা-বোনের জীবন ও ইজ্জতের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হলো। বিশ্বের মানচিত্রে একটা নতুন দেশের নাম স্থান করে নিল। একটা নতুন পতাকার জন্ম হলো।

বিজয়ের আনন্দে সবার মনে আনন্দ। যদিও বুকে বড্ড ব্যথা— স্বজন হারানোর ব্যথা। অনেকের চোখে আনন্দাশ্রু। মা-বাপ তার ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল, বড় ভাই পাঠিয়েছিল ছোট ভাইকে। যুদ্ধ এখন শেষ। অনেকেই বাড়িতে ফিরেছে। অনেক মা-বাপের ছেলের কোনো খোঁজ নেই, অনেক বড় ভাইয়ের ছোট ভাই বাড়ি ফিরে আসছে না। মনে শঙ্কা, তাহলে কি এরা আর কখনো ফিরে আসবে না! মা-বাপ, বড় ভাইদের স্বজন ফিরে পাবার অসহনীয় অপেক্ষা। ঘরের বউয়ের স্বামী ফিরে পাবার স্মৃতিঘেরা, শঙ্কাকুল নীরব অপেক্ষা। পিতৃহারা সন্তানের পিতৃস্নেহ পাবার অবুঝ অপেক্ষা।

কিছুদিন অপেক্ষা শেষে অন্তত লাশটা খুঁজে পাবার আপ্রাণ চেষ্টা। বিভিন্ন জায়গায়, বধ্যভূমিতে, লাশের গলিত স্তূপে আপনজকে খুঁজে পাবার চেষ্টা। আরো অপেক্ষার পর অগত্যা লোকমুখে শুধিয়ে শুধিয়ে পোশাক-চেহারার মিল খুঁজে অন্তত কঙ্কালটা ফিরে পাবার চেষ্টা। পরিশেষে ফিরে না-আসা স্বজনদের নিয়ে প্রতিবেশী-গ্রামবাসীদের সাথে অবসরে গ্রামের ত্রিমোহনীতে কিংবা বৈঠকখানায় বসে স্মৃতিমন্থন করা। সে-সাথে প্রতিটা কাজের মাঝে হারানো স্বজনের অতীত স্মৃতি নিয়ে স্মৃতিপটে আনমনা ভাবের উন্মেষ।

ব্যথার ব্যথী না-হলে সে মনোযন্ত্রণা ও নিস্পন্দ মানসিক-পরিস্থিতি হৃদয় দিয়ে সবটুকু উপলব্ধি করা যায় না। মহাসময়ের দ্রুতগতি ও ঘটনার অতিক্রমণে এ দুঃসহ মুহূর্তগুলো অসীমের নীলিমায় হারিয়ে যায়। দিনে দিনে সব ব্যথা-বেদনা, কষ্টকর বর্তমানগুলো ক্রমশ মুছে যেতে যেতে অতীত দিনের পাতায় বিলীন হয়ে যায়। শুধু বুকের মাঝে জমাটবাঁধা ব্যথার স্তূপ অমরত্ব পায়।

জাতির নেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এলেন। বাঙালি জাতির আশা-ভরসার স্থান ফিরে এলো। দেশের অভিভাবক ফিরে এলেন। বিগত নয় মাসে যুদ্ধ-করা, স্বজনহারা, বেদনাক্লিষ্ট বাঙালির নতুন জীবন তিনি কতটুকু উপলব্ধি করতে পারলেন, তা তিনি নিজে ছাড়া আর কারো বোঝার কথা নয়। তবে এ নয় মাসের ভিনদেশি কারাগারের ফাঁসির ভয়মিশ্রিত প্রকোষ্ঠ-জীবন যে তাঁর স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে আমৃত্যু ছিল, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর এ-দেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে ফাঁসিতে ঝোলার সম্ভাবনা ছিল অবধারিত, তিনি তাও বুঝতেন।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বজনহারার দল হারানোর ব্যথা অনেকটাই ভুলে গেল। সন্তানহারা মানুষ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। আশান্বিত আবেগপ্রবণ সাধারণ বাঙালি এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়তে প্রস্তুত। তারা একজন নেতার কথায় জীবন বিকিয়ে দিতে পারে, যা করতে বলেন তা-ই তারা পারে— শুধু নির্দেশের অপেক্ষা। কোনো দেশ গড়তে হলে এমন নেতাপাগল, কর্মপাগল, আনুগত্যশীল জনগোষ্ঠীই তো দরকার। এবার দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসার অপেক্ষা, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার অপেক্ষা।

আমার ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই পুরো লুঙি পরার অপেক্ষায়, ভরপেট খাবারের অপেক্ষায়। পাশের গ্রামের লাঠি খেলোয়াড় আজগর ভাই নির্ভয়ে কুঁচি-দেয়া হাফ-প্যান্ট পরে গ্রামের স্কুলমাঠে নিঃসংকোচে লাঠি খেলার অপেক্ষায়। করিম নানা জমি বিক্রি আর না-করার অপেক্ষায়, মেয়েগুলোকে গৃহস্থঘরে সহি-সালামতে বিয়ে দেবার অপেক্ষায়।

প্রাণপ্রিয় নেতা বললেন, 'আগামী পাঁচ বছর কিছুই দিবার পারবো না।' সবার মনে শক্তি, পাঁচ বছর তো কিছুই না— দেখতে দেখতে চলে যাবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, সময় তো লাগবেই। 'তেইশ বছর টেনেছি ঘানি, সম্বল এবার নৌকাখানি।' আর তেইশ বছরই-বা কেন? সেই ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই তো এ দেশের কপাল পুড়েছে। ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই, করিম নানা তাই বিনা প্রতিবাদে নেতার কথা মেনে নিলেন।

সাধারণ মানুষ ক্ষুধাতুর পেটে, মুখে হাসি আসে না— তবু ভবিষ্যৎ সুখের কথা ভেবে জোর করে হাসে। বিদেশি সাহায্য-সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া ত্রাণসামগ্রীর

অকিঞ্চিৎকর বণ্টন। তবু যা পায়, তাই খেয়ে আনন্দে হাসে, স্বাধীনভাবে হাসে। যুবক-যুবতী হাসে— তাদের ঘর হবে, সংসার হবে, উঠোনভরা ধান হবে। বর্গীর দল আর আসবে না, ভাবী সন্তান বড় উঠোনে খোলা মন নিয়ে স্বাধীনভাবে পা-পা করে হেঁটে বেড়াবে, যেখানে খুশি সেখানে যাবে, কেউ বাধা দেয়ার থাকবে না। নেতারা ভাবে ভাবে ইশারায় বলেছেন, 'ভাত দেব, কাপড় দেব, গয়না দেব, আরো কনে তোমায় দুলাবো বালিকা চৈতী কানের দুলে।' সহজ-সরল সাধারণ বাঙালির আবার চিন্তা কিসের! এবার কানের দুলে নিজেকে দোলানোর অপেক্ষা।

বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার জন্য এবং সাধারণ মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য অঢেল সাহায্য আসতে লাগলো। সাহায্যে ছোট্ট দেশ উপচে পড়ার উপক্রম হলো। রিলিফের গম, মালামাল চোরাপথে বাজারে বিক্রি হওয়া শুরু হলো। ত্রাণসামগ্রী কালোবাজারির কালো হাত ধরে পাশের দেশে চলে যেতে থাকলো। কার কম্বল কোথায় কে যে বেচে দিল, তা তদারক করার কেউ থাকলো না। সুযোগসন্ধানী নেতারা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ত্রাণসামগ্রী আত্মসাৎ করে ধনী হবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। সৎ নেতাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না। তাঁরা অসহায়ের মতো যার যার অবস্থানে থেকে দেখতে লাগলেন। সার্বিক অবস্থা দেখে ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই, করিম নানাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তাদের একটাই আক্ষেপ, 'এরা বললোটা কী, আর করছেটা কী!'

এলাকার যেসব নেতার প্রতি এতদিন এদের অবিচল আস্থা ছিল, তারা এখন গনিমতের মালের মতো লুটপাট, ভাগ-বাটোয়ারায় ব্যস্ত। ভাগ-বাটোয়ারা ও নেতৃত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মারামারি শুরু হলো। আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, এমন প্রত্যেকের কাছেই অস্ত্র। নিজ কোমরের ছুরি পেটে বিঁধে অনেকেই মারা গেল। এসবে বাধা দিতে গিয়ে অনেক আদর্শবান মুক্তিযোদ্ধাও জীবন দিলেন।

এসব কর্মকাণ্ড নিয়ে সিনেমা তৈরি হলো। দর্শককুল পরিতৃপ্তির সাথে বাস্তবতাকে মিলিয়ে সিনেমা উপভোগ করলো। দাতা সংস্থা ও বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ একটা 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নামে খ্যাতি অর্জন করলো।

কোনো কোনো নেতার আত্মীয়-স্বজনও আরো একধাপ এগিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখাতে শুরু করলো। বাহিনী তৈরি করলো। কালো টাকা অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নেতৃত্বে চলে এলো।

প্রধান নেতা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখতে লাগলেন। উদারনৈতিক ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী মানুষটি সবকিছু দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমার এখনো কানে বাজে তাঁর সেই অসহায় অবস্থার দিনগুলোতে বিভিন্ন সময়ে দেয়া বক্তৃতাগুলোর কিছু কিছু কথা। তাঁর বক্তৃতায় বাস্তব অবস্থা ফুটে উঠতো। তিনি যা বলতেন, খোলামেলা বলতেন। কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় তিনি বুঝতেন না। বলতেন, 'আমি কাকে কী বলবো, সবাই তো আমার।' 'সাড়ে সাত কোটিরও বেশি কম্বল পেয়েছি, আমার কম্বলটা কই?' 'সবাই পেয়েছে সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি।' 'চাটার দল সবকিছু চেটেই শেষ করে ফেললো'— ইত্যাদি।

তাঁর এসব কথা একসাথে গাঁথলে সে সময়ের ভয়াবহতা ও তাঁর অসহায়ত্বের করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। এ মহান নেতার একাত্তরের পরে দেয়া বক্তৃতাগুলোর রেকর্ড কোথায় যে হারিয়ে গেল, তা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো উপলক্ষ্যে কোনো অনুষ্ঠানে এগুলো আর বাজানোও হয় না। কেন যে হারিয়ে গেল, তা আমার বুঝে আসে না। ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই, করিম নানা গংয়ের বংশধরেরা সেগুলো আজও খুঁজে পাবার অপেক্ষায়। তারা জাতীয় চরিত্র নির্ণয়ে জাতীয় নেতার মূল্যবান সত্যভাষণ শোনা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষায়।

বিশ্ব তখন দুটো ব্লকে বিভক্ত: সোভিয়েত ব্লক ও মার্কিন ব্লক। ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুরাষ্ট্র। ভারতের সমরাস্ত্র ও শিল্প উন্নয়নে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক অবদান আছে। যদিও ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ব্যবস্থা নিজেদের দেশে গ্রহণ করেনি। পাকিস্তান মার্কিন ব্লকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি সমাজতন্ত্রী-বিপ্লব রপ্তানি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের বিস্তার রোধে বদ্ধপরিকর— বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। সমাজতন্ত্রের নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি ও বিশ্বসম্পদ শোষণ নীতির পরিপন্থী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত

ইউনিয়নের অবদান অনস্বীকার্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমাজতন্ত্রের নীতি এদেশে প্রয়োগ করতে চায়।

একটা নির্দিষ্ট অংকের বেশি পরিশোধিত মূলধন আছে এমন সকল মিল-কলকারখানা, ব্যাংক-বীমা, সেবা প্রতিষ্ঠান সোভিয়েত ইউনিয়নের আদলে জাতীয়করণ করা হলো। এজন্য বিভিন্ন কর্পোরেশন গঠন করা হলো। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির মধ্যে 'সমাজতন্ত্র' সংযোজিত হলো। 'মনে আশা আছে রে বন্ধু যাব তোমার ঘর, মনে আশা আছে রে বন্ধু ...।' যদিও অনেক উচ্চাশা নিয়ে, মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতীয়করণ করা হলো, জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি পেয়ে তোষামুদে 'চাটার দল' ঐ সমস্ত কর্পোরেশনে সুবিধামতো বিভিন্ন পদে পোস্টিং নিয়ে জনসাধারণের কোষাগার লুটতরাজ অব্যাহত রাখলো। সরকারি কর্পোরেশন মানে তো তাদেরই কর্পোরেশন, সেটা সমূলে ভোগ করার স্বত্বাধিকারী তো তারাই। যার যত তদবিরের জোর বেশি, সে তত বড় পদে পদাসীন হলো। কোথাও কোনো নিয়মনীতি নেই, না-আছে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বালাই। 'ওলট-পালট হয়েছে মা, এবার লুটেপুটে খাই।' শুভদিনের যাত্রা শুরু হলো। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা কর্পোরেশনগুলোর লোকসান পূরণের জন্য জোগান দেয়া শুরু হলো। যদিও কর্পোরেশনগুলোতে নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। যারা যে-সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছায়াতলে ইউনিয়নের নেতা হতে পেরেছে, তাদেরই কেবল পোয়াবারো। তাদের উপরের একটা পক্ষও রাজনীতির ছায়াতলে বসে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের স্বার্থটা শুষে নিতে থাকলো।

স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম থেকেই এ দেশের রাজনীতি সকল অপকর্মের আশ্রয়দাতা এবং সকল শোষকের জননীরূপে আবির্ভূত হলো। এ জননীর আদর্শবান(?) রাজনৈতিক সন্তান প্রসবের কোনো শেষ নেই। এ ধারা আজও অব্যাহত।

বাম রাজনীতি এ দেশে অনেক আগে থেকেই ছিল। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোও বাম রাজনীতির ধারায় চলছিল। এ দেশেও তার ছোঁয়া লাগলো। পুরো বাম রাজনীতিতে দুটো ধারা বিদ্যমান— পিকিংপন্থী এবং মস্কোপন্থী। ঐ সব দেশ থেকে এ দেশের রাজনীতিবিদদের কাছে দল পরিচালনার জন্য নিয়মিত অর্থের জোগান আসতো। তা দিয়ে তারা নিজে চলতো, দল চালাতো। এসব টাকা খরচ

করে তারা সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কার করলো— নাম ‘বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র’।

১৯৭৩ সালে দেশে আবার সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হলো। মাঠে আওয়ামী লীগ সর্বেসর্বা। তারাই জয়ী হবে এটা সবারই জানা। এ নির্বাচন আইনগত বাধ্যবাধকতা। প্রতিযোগিতায় অল্প কিছু বামদল। তারপরও নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও ভোটবাক্স ছিনতাই হলো। এটা এ দেশের ভোট ব্যবস্থায় প্রথম কারচুপি এবং সে সময়ের ক্ষমতাসীন দলের স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ।

স্বাধীনতার পর থেকে বাম রাজনীতি ক্রমশই রাজনীতির মাঠ গরম করে তুলতে লাগলো। মিল-কলকারখানা জাতীয়করণের নীতি সমাজতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় মস্কোপন্থী দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করলো। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনাময় মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বাম তরিকায় ‘প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারায়’ ছবক নিতে থাকলো। পুঁজিবাদ, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া শব্দগুলো বার বার উচ্চারিত হতে থাকলো। পিকিংপন্থী বামধারাও তাদের কার্যক্রম-প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। দুই বামের মধ্যে ছুরি-কাটাকাটি সম্পর্ক। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণে মতদ্বৈধের কারণে উভয় পন্থীরাই ভাঙ্গনের কবলে পড়ে ক্রমশই ব্রাকেট-সর্বস্ব দলে রূপ নিতে থাকলো। উভয়পক্ষই শ্রেণিশত্রু খতমের নুসকা বাতলাতে লাগলো। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় জীবন বাঁচানোর তাগিদে ভয়ার্ত জীবন কাটাতে লাগলো।

বাম রাজনীতিকে কঠোর হাতে দমনের জন্য নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সমান্তরালে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলা হলো— নাম ‘রক্ষীবাহিনী’। দেশে বিভিন্ন এলাকায় যুবলীগে অংশগ্রহণকৃত নেতারা রক্ষীবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত হলো। রক্ষীবাহিনী তাদের নির্বিচার অপারেশন চালিয়ে যেতে থাকলো। দুই বামপন্থী দল— বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়ার ধুয়ো তুলে মানুষ হত্যা শুরু করলো। যুবলীগের তত্ত্বাবধানে বিনা বিচারে বামপন্থী নামাবলিতে মানুষ নিধনযজ্ঞ চলতে থাকলো।

ময়লার এপিঠ-ওপিঠ দু-পিঠেই গন্ধ। যে পক্ষই হোক, যত ভালো ভালো তত্ত্বকথার মোড়কেই বাঁধা হোক-না কেন, বিনা বিচারে জীবননাশ কোনোক্রমেই

মেনে নেয়া যায় না। মানুষ হত্যা করে কেউ কোনোদিন গণমানুষের মুক্তি বয়ে আনতে পারেনি, শান্তিও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকেই দুটো জিনিস বেশ সস্তাই ছিল– নুন ও খুন। খুনের বাজার সস্তাই থেকে গেল। নুনের বাজার ক্রমশই অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের সাথে পাল্লা দিয়ে আক্রা হতে লাগলো। বছর যত বাড়ে, দ্রব্যের গায়ে তত আগুন। মূল্যতাপে দ্রব্যের গায়ে হাত দেয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। খাদ্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল। ভিক্ষার অভাব দেখা দিল। সবাই বললো এটা চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ। মানুষের পেটে খাবার নেই, ঘরে খাদ্যশস্য নেই। টাকারও মূল্য নেই। জীবনের মূল্যও নেই। যত মূল্য আছে জিনিসের। বণিকরা স্থানীয় নেতাদের সহায়তায় কালোবাজারিতে মত্ত। মজুতদার অধিক লাভের আশায় মজুতদারিতে ব্যস্ত। ক্ষুধায় সারা দেশে হাহাকার পড়ে গেল। রেশনের ডিলার স্থানীয় নেতার যোগসাজশে রেশনের গম-চাল অন্য কোথাও বেশি দামে বিক্রি করে দিচ্ছে। রিলিফের গম চোরাপথে বিক্রি হচ্ছে। বিদেশ থেকে সাহায্যের নামে যা-ই আসে না কেন, 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র তলা দিয়ে চলে যায় লুটেরা শ্রেণির পকেটে। দেখার কেউ নেই, বলার কেউ নেই। 'জোর যার মুল্লুক তার।' 'কার গোয়াল, কে দেয় ধুমো' অবস্থা।

জনপ্রশাসন এবং জনব্যবস্থাপনা প্রশাসনতন্ত্রের বই ছাপানোর জন্য কেবল টেন্ডার আহ্বানের জোর তোড়জোড় শুরু করেছে। বই ছাপানো হবে, সেই বই পড়ে জ্ঞানার্জন করা হবে। তারপর দেশের শাসনব্যবস্থায় অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করা হবে। অনেক দীর্ঘ সময়ের দরকার। রোগী মৃত্যুর আগে খাবি খাচ্ছে, জাকান্দানি চলছে– ওঝা ছয় মাসের পথে ঘোড়ায় চড়ে হেঁটে আসছেন।

সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে গণমানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রধান দলটা গণতন্ত্রের পথ থেকে সরে এলো। একদলীয় শাসন চালু করলো– নাম দিলো 'বাকশাল'– 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ'। মেহনতি মানুষের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন। মেহনতি মানুষের মুক্তি। দুর্মুখেরা বলা শুরু করলো– বাকস্বাধীনতার 'শাল' (দীর্ঘশূল)– 'বাকশাল'। তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগে গলদ দেখা দিলো। বই ও বক্তৃতার তত্ত্বকথা এবং বাস্তবতা ভিন্নরূপ হলো। দরকার 'না-চাটার দল'; কাজে নিয়োগ পেলো 'চাটার দল'। মানুষ না-গড়ে, সিস্টেম

ডেভেলপ না-করে আগেই 'বাকশালী শাসন' প্রয়োগ হলো– গোলে হরিবোল দিয়ে কাছিম জড়ো করার মতো হলো। গণতান্ত্রীক প্রক্রিয়া ও বাকস্বাধীনতার অপমৃত্যু। পরিণতি হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। 'যদি বলি পেয়েছি যা তার আদৌ কিছু চাইনি, চেয়েছি যা নিজের করে, পাইনি– কিছুই তার পাইনি।' দেশের প্রশাসনব্যবস্থা ও অর্থনীতির দিকনির্দেশনার হ-য-ব-র-ল অবস্থা চলতে থাকলো। সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফুঁসে উঠতে লাগলো। আমার ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই, করিম নানা ভাত-কাপড়ের অভাবে ঘরের পিঁড়েয় বসে বসে মনের দুঃখে হারানো দিনের গানে সুর দিতে লাগলো, 'আমি যা চেলাম তা পেলাম কই? তুমি কেন মজালে সই বাজারে এনে?'

জনপ্রশাসন যদি দলমত নিরপেক্ষ না-হয়, আইনের যদি সুষ্ঠু প্রয়োগ না-হয় এবং অর্থনীতির তত্ত্ব যদি 'মূলধন আরো মূলধন বাড়ায়' হয়, তাহলে– একটা নীতিহীনতা আরো দশটা নীতিহীনতাকে তৈরি করে। একটা অব্যবস্থা সকল অব্যবস্থাকে জাগিয়ে তোলে। একটা স্বজনপ্রীতি অগণিত স্বজনপ্রীতির দরজা খুলে দেয়। একটা দুর্নীতি অসংখ্য দুর্নীতির পথকে প্রশস্ত করে। একটা বিচারহীনতা অজস্র সন্ত্রাসীকে জন্ম দেয়। মানুষ হত্যার রাজনীতি শত-সহস্র পাল্টা হত্যাকে উসকে দেয়। এ নিয়ম দিয়েই প্রকৃতি চলছে।

সাধারণ মানুষ অসহায়। 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়'-এর মতো সরকারি ও বিপ্লবী নামধারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পড়ে সাধারণ মানুষ অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হতে লাগলো। অনেক সম্ভাবনাময় তাজা প্রাণ যূপকাষ্ঠের বলির পাঁঠা হয়ে ঝরে গেল। পাকা আম পাড়ার জন্য ডালে জোরে ঝাঁকি দেয়াতে কাঁচা-পাকা সব আমই পড়তে লাগলো। তখন সাধারণ মানুষের আর ভাত-কাপড়ের দরকার নেই, শুধু জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত– জীবনটা বাঁচিয়ে শান্তিতে বসবাসের অপেক্ষায়।

পাঁচ

তখন কেবল লায়েক হয়ে উঠছি। অজপাড়াগাঁয়ের ছেলে।গ্রামে একটু বেশি বয়সে স্কুলে যাওয়া শুরু হয়। ক্লাস নাইনে উঠেই বন্ধুদের কেউ কেউ বিয়েশাদির পর্বটা চুকিয়ে ফেলেছে। আমারও তেমন কথাবার্তা চলছে। কথাগুলো আড়ালে-আবডালে বসে শুনতে বেশ ভালই লাগে। পারিবারিক সূত্রে বেশ কিছু জমিজমা ও সম্পদের মালিক আমি। উপেক্ষার পাত্র নই।গ্রামীণ বিয়ের বাজারে বেশ কদর।

চলাফেরায় পরিবর্তন এলো। ডালিমে পাক-ধরার আগে যেমন একটু একটু লালচে রং গায়ে ধরে, আমার মনেও অমন কাঁচা রঙের ছোঁয়া লেগে উঠছে। ঘরে ঢুকেই আয়না সামনে ধরে বেশি বেশি করে মুখ দেখি। সবকিছুই আমি বেশি বেশি বুঝি এমন একটা ভাব মনের মধ্যে পোষণ করি। সব কিছুতেই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালো লাগে। পুব মাঠের ফুরফুরে বাতাসে মনটাকে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

সপ্তাহান্তে প্রতি বৃহস্পতিবারে স্কুলের একটা বড় ক্লাসরুমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসে। কেউ নাটক করার রিহার্সল দিচ্ছে, কেউ কবিতা আবৃত্তির চর্চা করছে, কেউ-বা গান গাচ্ছে। বছর শেষে বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে, প্রতিযোগিতা হবে, পুরস্কার বিতরণী হবে। সে অপেক্ষা।

গানের প্রতি আমার আকর্ষণ। সময়ের গান বলা, জীবনের গান গাওয়া আমার আবাল্য শখ। প্রতিকূলতা হলো কণ্ঠস্বর ভালো নয়। ক্লাসরুমের মধ্যে সামনের দিকে চৌকি পাতা। সেখানে বসে উপস্থিত সবার সামনে হেঁড়ে গলায় চিৎকার করি। হারমোনিয়াম যায় একদিকে, আমার সুর যায় অন্যদিকে। আমার গান শুনে অনেকেই হাসাহাসি করে। কেউ-বা মুচকি হাসে, কেউ হাসে হো হো করে। আমি নাছোড়বান্দা। অনুষ্ঠানের সামনের চৌকিতে বসলে অন্য কিছু হোক না-হোক, মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। ভালো লাগে। এটা বয়সের ভালোলাগা। গানটা গেয়েই সামনের সারিতে পাতা বেঞ্চে জায়গা করে নিই। এ নেশা প্রতি বৃহস্পতিবারের নেশা।

একদিন গান শেষ করে সামনের দিকে তাকাতেই একটা মেয়ের চোখে চোখ পড়লো। তার প্রখর দৃষ্টিটা যেন অন্তরে গিয়ে বিঁধলো। হরিণ-চপলা মায়াবি ডাগর দুটো চোখ। চোখ দুটো সে দ্রুত ফিরিয়ে নিল। গান শেষে সামনের বেঞ্চে তার পাশে এসে বসলাম। পাশ ফিরে তার দিকে কয়েকবার তাকালাম। সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, আমি অন্যদিকে তাকালে সে আমাকে বার বার দেখছে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

দল বেঁধে স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে আমরা কিছুদূরের সহযাত্রী। এতদিন এমন করে ভাবিনি। তাকে কখনো গুরুত্ব দিয়ে দেখিনি। তার বাড়ি অন্য গ্রামে। স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রায় এক মাইল অভিন্ন পথ। তারপর ছোট একটা নদী। এলাকার মানুষ বলে গাঙ— মরা গাঙ। শীত এলে মৃতপ্রায় হয়ে যায়। বর্ষা এলে স্রোত বয়। কখনো দু কূল উছলে যায়। গাঙের ধার ঘেঁষে বাঁশঝাড়, হিজলের সারি— শাখা বেয়ে গাঙের পানির উপরে এসে থেমেছে। কোথাও বন, আগাছায় দু পাশ ছেয়ে গেছে। স্কুল থেকে গাঙ পর্যন্ত এসে সে চলে যায়, গাঙের ধার দিয়ে যে রাস্তা সোজা পুবদিকে চলে গেছে, সেদিকে। আমার গাঙ পার হওয়া লাগে। গাঙ পেরোলেই আমাদের গ্রাম। গাঙ পার হতে বাঁশের সাঁকো। পাশে-বাঁধা বাঁশ ধরে সাঁকো বেয়ে এক পা এক পা করে পার হতে হয়। না-জানি কখন পা পিছলে নীচে পড়ে যাই! আসা-যাওয়ার পথে এ-এক রোমাঞ্চ।

গ্রাম থেকে আমরা সাধারণত তিনজন এক-দলে হেঁটে স্কুলে আসি। পাজামা পরা, ফ্লাইং শার্ট গায়ে, রবারের চটি স্যান্ডেল পায়ে। পটাশ পটাশ শব্দে গ্রামের পথে ধুলো উড়িয়ে চলি। ওরা চারজন দল বেঁধে একসাথে স্কুলে আসে। আসা-যাওয়ার পথে মাঝেমধ্যে ওদের সাথে দেখা হয়— কথা হয় না।

ঐ দিন স্কুল ছুটির পর একসাথে দল বেঁধে স্কুল থেকে বেরোলাম। কিছুদূর এসে ওরা চারজন মেয়ে জোর পায়ে হেঁটে আমাদের তিনজনকে পিছে ফেলে সামনে চলে গেল। তারপর আবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর নিজেরা কী ভাবলাম জানিনে— এবার আমরা তিনজন একটু জোরে হেঁটে ওদেরকে অতিক্রম করে সামনে চলে এলাম। দেখলাম, ওরা আমাদের সাথে কোনো পাল্লা দিল না। আমরা পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসার পর ওরা খুব হাসাহাসি করতে লাগলো। আমরাও

নিঃশব্দে হাসলাম। আমরা আবার ওদের আগে আগে স্বাভাবিক গতিতে চলছি। গাঙপাড়ে এসে ওরা ওদের পথে চলে গেল। আমরা সাঁকো পার হলাম।

বাড়িতে এলাম। সেই একজোড়া ডাগর চোখ একবারেই মনের চোখে গেঁথে গেছে। বার বার চোখ দুটো আমার চোখে ভাসছে। রাতে শুয়ে কী যেন এলোমেলো ভাবছি। চোখ বুজলেই দেখছি, ঐ-দুটো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

পরদিন স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটি। তারপর আবার পুরো সপ্তাহ। চলতে পথে দেখা হতেও পারে, না-ও পারে। ভরসা সেই আসছে বৃহস্পতিবার।

সেই বৃহস্পতিবার ছাড়া অবশ্য আর দেখা হলোও না।

আমি স্টেজে উঠেছি। ও সামনের বেঞ্চে বসে আছে। আমি বার বার ওর দিকে তাকাচ্ছি। চোখাচোখি হচ্ছে। ও চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। স্টেজ থেকে ফিরে বেঞ্চে ওর পাশে এসে বসলাম। একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছো?' ও বললো, 'ভালো, তুমি?' 'আমিও ভালো'— চোখে চোখে উত্তর দিলাম। ও প্রথমবারেই তুমিতে চলে এসেছে। তারপর অনুষ্ঠানে ওর নজরুলগীতি গাওয়া নিয়ে অল্প কিছু কথা হলো। ও সাধারণত নজরুলগীতি গায়, মাঝেমধ্যে আধুনিক গানও গায়। গলাটা মোটামুটি ভালো।

যুদ্ধের কারণে আমার পাঠবিরতি আছে। আমি পড়ি নিউ টেনে, ও ক্লাস এইটে।

ভালো লাগলো। মায়া জড়িয়ে গেল। অনেক সময়ই ক্লাসে বসে থাকতে ভালো লাগতো না। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম। বারান্দা দিয়ে ওদের ক্লাস পেরিয়ে নীচে নামতে হতো। নীচে কলপাড়। পানি খাওয়ার নাম করে ক্লাসের বাইরে আসি। আমাকে আসতে দেখলেই সে-ও কলপাড়ে চলে আসে। দেখা হয়। বেশি কথা বলা যায় না। কী জানি কে কখন কোথা থেকে শুনে ফেলে, দেখে ফেলে! শুধু টুকিটাকি, 'কেমন আছো' এই জিজ্ঞাসাটুকু, আর চোখাচোখি। চোখের ভাষায় মনের অনেক কথা বলা। মাঝে মাঝে আশপাশে কেউ না থাকলে পাশে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলি। এতেই তৃপ্তি, মহাতৃপ্তি।

নিজের অজান্তেই মনের এক কোণে কোথাও যেন ও একটা জায়গা দখল করে নিয়েছে। ওর জন্য ভীষণ মানসিক দুর্বলতা জন্ম নিয়েছে। স্কুলে সব সময় আমি ওকে চোখে চোখে রাখি। ও স্কুলের প্রতিটা কাজে ও কথায় আগে আগে থাকে।

খেলার মাঠে ও-ই সেরা। চেহারায় ও শরীরের গঠনে ওকে সবার থেকে সহজেই আলাদা করা যায়। ওর সবকিছুই আমার ভালো লাগে। ওর বাড়ন্ত শরীর, উচ্ছলতায় ভরা চলাফেরা, চপলা এক জোড়া ডাগর চোখ, হাসিভরা মুখ আমার নিত্য সময়ের মনের আয়নায় তোলা ছবি, নিভৃত কল্পনার সাথী। ওকে নিয়েই সারাক্ষণ মনে তোলাপাড়া, সমস্ত আশার কেন্দ্রবিন্দু, ভবিষ্যৎ স্বপ্নচারিতা। এ-এক নিদারুণ অস্বস্তি! রাতে ঘুম নেই। ঘুমালেই ওকে নিয়ে স্বপ্ন। একদিন ওকে না-দেখলেই অস্থির হয়ে উঠি।

ওর সাথে মন খুলে অনেকক্ষণ কথাও বলতে পারিনে। স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে দল বেঁধে একসাথে হেঁটে যাওয়া— একাকী পাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। পথে কারো কোনো কথা নিয়ে একসাথে প্রাণখোলা অতৃপ্ত হাসি। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসা। অল্প কিছু গৎবাঁধা কথা বলা, আর দৃষ্টি বিনিময়।

এক বৃহস্পতিবারে একটা বকুল ফুলের মালা হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে গেলাম। বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছি। আমি হাইবেঞ্চের নীচ দিয়ে মালাটা ওর হাতের মধ্যে গুঁজে দিলাম। ও তাড়াতাড়ি মালাটা হাতে নিয়ে ওড়নার নীচে লুকিয়ে রাখলো।

ক্লাসে বসে যখন ওকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে, পানি খাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে ওর ক্লাসের সামনে দিয়ে কলপাড়ে আসি। অপেক্ষা করি— ও কখন আসবে। আজও তাই করলাম। আবার দেখা হলো। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘মেলায় যাচ্ছি, তোমার জন্য কী আনবো?’ ও উত্তর দিল, ‘তোমার যা মনে চায়।’ মেলা থেকে ওর জন্য একটা বড় পুঁতির মালা কিনেছিলাম। দেয়ার সুযোগ হচ্ছিল না। কলপাড়ে এলাম। সেও এলো। ইশারায় ওকে স্কুলের পিছনে করবীতলায় যেতে বললাম। ও গেল। আমিও একটু পরে গেলাম। মালাটা ওর হাতে দিলাম। যদিও ইচ্ছে হচ্ছিল, মালাটা ওকে নিজ হাতে পরিয়ে দিই। পাশে আলাল দপ্তরির কুঁড়েঘর। ঘরের পাশে কুলগাছ। আলাল দপ্তরির বাড়ি থেকে তার মেয়ে বেরিয়ে আসতেই ও কুলতলায় চলে গেল। ও যেন কুল কুড়াতে এসেছে। আমি চলে এলাম।

অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু কোথায় গিয়ে বলবো! যেদিকে তাকাই সে দিকেই মানুষ, সেখানেই বাধা। সমাজ আমাদের এই হাবভাবকে ভালোভাবে নেয় না। সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্কুলের খাতায় ওর নাম সুদূরিকা। বান্ধবীরা ডাকে 'সুদূরী'। আমিও ডাকি 'সুদূরী', কখনো-বা শুধু 'সুদূ'। ওকে নিয়ে আমার যত স্বপ্নচারিতা। সব কল্পনার কেন্দ্রবিন্দু আমার 'সুদূ'। উঠতি বয়সের নির্মল প্রেমরেখা। মনের মুকুরে গভীরতর একটা নতুন মুখের প্রদীপ্ত ছাপ।

কখনো স্কুল ছুটির পর ওরা আগে বেরিয়ে আসে। হয়তো আমরা কেউ ওকে দেখিনি। আমাদের আসা দেখলেই সুদূরী একা পথের ধারে বড় গাছের আড়ালে নিজেকে লুকোবে। হয়তো ভেবেছে, আমি ওদের দলে ওকে না দেখে কষ্ট পাব। সুদূরী হঠাৎ পিছন থেকে এসে উচ্চস্বরে হেসে উঠবে। আবেগঘন উচ্ছ্বসিত হাসি। আমরা হতচকিত হয়ে যাব। এতেই ওর আনন্দ। সবারই অগভীর বুদ্ধি, হালকা চিন্তাধারা।

আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদরের বৃষ্টিতে গ্রামের কাদা-পিচ্ছিল পথ। পথে পা ধরে হাঁটা কঠিন। স্কুল ছুটির পর পরই স্যান্ডেল হাতে নিয়ে, পাজামা গুটিয়ে দল বেঁধে বাড়িমুখী চলা। এও এক আনন্দোৎসব। কেউ পিছলে পড়ে আছাড় খেলে সে কী হাসাহাসি! আমি সুদূরীর দিকে তাকাই। চোখে চোখ পড়ে। মনের কথা হাসিতে বলি।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে ও সুদূরীকে নিয়ে কিছু কথা স্কুলের বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো। বন্ধুমহলে কানে কানে ফিসফিস কথা। কারো কারো হাল্কা রসিকতা।

ওর সাথে অনেকক্ষণ ধরে নিরিবিলি একাকী কথা বলার খুব ইচ্ছে। সে-ও তাই চায়। কোনো সুযোগ হয়ে ওঠে না। গ্রামের রাস্তা স্কুলের পাশ দিয়ে এসে যশোর রোডে মিশেছে। মনে মনে ভাবি, ওকে সাথে নিয়ে একদিন জেলা শহরে সিনেমা দেখতে যাব। দুজনে পাশাপাশি সিটে বসে বাদাম খাব। ও বাদামের খোসা ছাড়িয়ে আমার মুখে দেবে, আমি দেব ওর মুখে। অনেক করে গল্প করবো, আর মন ভরে সিনেমা দেখবো। দুজনে স্টুডিওতে গিয়ে ছবি উঠবো। মনে প্রশ্ন, ওর বাড়ি থেকে একাকী শহরে যাবার অনুমতি মিলবে তো?

একদিন কলপাড়ে বললাম, 'আজ টিফিন পিরিয়ডে ছুটি নিয়ে একাকী চলে যাব, তুমিও ছুটি নিও।'

আমি ছুটি নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে ওর জন্য অপেক্ষা করছি। ও এলো। অনেক আশা, অন্তত এক মাইল পথ দুজনে কথা বলতে বলতে যাব। পথ চলতে যখনই দুজনে কাছাকাছি হয়ে কথা বলতে যাই, অমনি দেখি পথে মানুষ। রাস্তার দু ধারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে-আসা মহিলারা চেয়ে আছে আমাদের দিকে। কী অসহ্য! তেমন কোনো কথাই হলো না, কিছু কথা হলো, অথচ পথ ফুরিয়ে গেল।

গাঙের ধার ঘেঁষে যে একপেয়ে পথ সামনের দিকে চলে গেছে, আমার খুব ইচ্ছে, সুদূরীর হাত ধরাধরি করে ঐ পথ বেয়ে গল্প করতে করতে দুজনে দূরে কোথাও চলে যাই।

গাঙপাড়ের প্রতিটি গাছ, আগাছা স্মৃতি দিয়ে মোড়া। ওর মাঝে প্রতিক্ষণে সুদূরীকে খুঁজি। আমিও বুঝি, সুদূরী আমাকে ধরে আজীবন সুখের ঘর বাঁধতে চায়। আমিও তাতে রাজি। ওকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে পাশে পেতে চাই। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে এক সাথে জীবন-পথ চলতে চাই। ওর আনন্দে আমি খুশি। চলার পথে ওকে আমি প্রেরণা হিসেবে পেতে চাই। ও বেড়াতে ভালোবাসে, আমিও তাই— দুজনে জীবনটা ঘুরে ঘুরে কাটাতে চাই। কলপাড়ে ও করবীতলায় দাঁড়িয়ে দুজনে দিনে দিনে অনেক কথাই বলেছি। দুজনে দুজনাকে চিনেছি। দেখেছি, ওর সাথে আমার চিন্তাধারা, পছন্দ ও রুচিতে অনেক মিল।

ইতোমধ্যেই আমার পোশাকের পরিবর্তন করেছি। পাজামা ছেড়ে ফুলপ্যান্ট ধরেছি। রবারের স্যান্ডেল ছেড়ে বাটা কোম্পানির চামড়ার স্যান্ডেল কিনেছি। একটা জুতোও কিনেছি। হাতে ঘড়ি পরা শুরু করেছি। এতদিন চুলে তেল মাখতাম। তেলমাখা ছেড়েছি। মাঝেমধ্যেই চুলে শ্যাম্পু করছি। চুল ও চেহারার যত্ন নিচ্ছি। নীল রঙের একটা ডায়েরি কিনেছি। তার ভেতরের কভারের সাথে ছোট্ট একটা আয়না সেট করা। বার বার ডায়েরি খুলে আয়নায় মুখখানা দেখি, চুলগুলো পরিপাটি করি। পাশে ভেসে ওঠে সুদূরীর হাসিমাখা মুখ। পৃথিবীর যেদিকে তাকাই রঙের ছাপ দেখি— তার মাঝে সুদূরীর স্নিগ্ধ-মেদুর মুখখানা। রং লেগেছে চোখে, মনেও— কাঁচা বয়সে কাঁচা রঙের ছোঁয়া।

ছয়

সুদূরীর কথার সাথে বাতাসে আরো কিছু কথা ভেসে কানে পৌঁছাতে লাগলো। আমি বামপন্থী রাজনীতির তালিকায় বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে গেছি। এখন জীবন-মরণ সমস্যা— 'শ্রেণিশত্রু খতমের' আওতাভুক্ত। সর্বহারাদের আমার পৈতৃক সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করে না-দেয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই।

এলাকায় আমার একটা বিরোধীপক্ষ আছে। আমার সম্পদলোভী পক্ষ। রাজনীতির সব তরিকাতেই তারা আগে আগে থাকে। ডান-বাম সব দলেই সমান বিচরণ। আমি লায়েক হয়ে উঠছি— এটা তাদের চক্ষুশূল। বাম রাজনীতির উত্থানে তারা সেখানে যোগ দিয়েছে— আমি তাদের টার্গেট। আমার গায়ে তখন বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়ার রং। মাঝেমধ্যে বাড়িতে এসে খোঁজ নেয়, হানা দেয়। আমি গা-ঢাকা দিয়ে চলাফেরা করি। রাতে ঘরে থাকিনে। মাঠে রাত কাটাই। ছোটবেলার খেলার সাথী সেলিম ভাই আমার মাঠে রাত কাটানোর সাথী।

গ্রামের সাধারণ মানুষ আমরা। পালাতে গেলে মাঠে পালাই। আখ ক্ষেত, পাট ক্ষেত আমাদের শেষ ভরসা। প্রয়োজনে ডোঙায় চড়ে বিলের গলা পানিতে আমনধানের মধ্যে গিয়ে সারা রাত বসে থাকি। মশার পাল ক্ষেতের মধ্যে চারদিক থেকে এসে বুনবুন শব্দে জড়িয়ে ধরে। সারারাত খায়। হাত-পা-মুখ থেকে মশা তাড়াবার কোনো জো নেই, মুছে ফেলতে হয়, আবারও জড়িয়ে ধরে। বর্ষার রাতে ছাতা মাথায় দিয়ে ক্ষেতে বসে রাত কাটানো আরো কঠিন। পা বেয়ে কেঁচো ওঠে। ঝম ঝম বৃষ্টিতে গোড়ালি-ডোবা পানিতে সারা রাত দাঁড়িয়ে কাটানো লাগে, ক্লাসের ধর্ম বইতে পড়া হাবিয়া দোজখের কষ্টকেও হার মানায়। পা দুটো ধরে যায়, কোথাও বসা যায় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। এর শেষ কোথায় আমরা কেউ জানিনে। শরীরেই-বা আর কত কুলাবে! তবু দিন পার করি, রাত আসে, রাত যায়।

সেলিম ভাই একটা বাম-গ্রুপের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলো। উদ্দেশ্য— টিকে থাকতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হয়েছে বটে, টিকে থাকার সংগ্রাম শুরু হয়েছে, বেঁচে থাকার আপ্রাণ সংগ্রাম চলছে। এতে আমার কোনো লাভ হলো না। এলাকায় গ্রুপের অভাব নেই। আমার সম্পদ দখলেচ্ছু গ্রুপ কৌশল বদলালো। সব গ্রুপের হাতেই অস্ত্র। অস্ত্র ভাড়ায় পাওয়া যায়, ভাড়ায় ঘাতকও পাওয়া যায়। ওরা একাধিকবার আমার বাড়িতে হানা দিয়েছে, আমাকে ধরতে পারেনি। দিনের বেলায়ও বাড়িতে থাকিনে— মাঠে মাঠে থাকি। মা কাউকে দিয়ে মাঠে ভাত পাঠিয়ে দেন। কখনো খাই, কখনো না-খেয়েই দিন কাটে। আখ ক্ষেত, পাট ক্ষেতকে আপন করে নিয়েছি।

কদাচিৎ হঠাৎ স্কুলে যাই। সুদূরীর সাথে দেখা হয়। কলপাড়ে অল্প কিছু কথা হয়। আমার বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা কিছুই বলিনে। পাছে ও কষ্ট পাবে, ভীষণভাবে কান্নাকাটি করবে। স্কুলে গেলে বাড়ি ফিরি অন্য পথ ঘুরে।

স্কুলজীবনেরও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সামনে বিদায় নেবার পালা। পড়াশোনা করা লাগে-না বললেই চলে। যুদ্ধের পর থেকে এ অবস্থা। পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে নকলের ছড়াছড়ি— নকলের উৎসব। কার খাতা কে লিখে দিচ্ছে— বোঝা কঠিন। একজন পরীক্ষার্থীর সাথে পাঁচজন সাহায্যকারী। কেউ নকল খুঁজে আনছে, কেউ-বা পাশে বসে বই ঘেঁটে নকল বের করছে, কেউ-বা পরীক্ষার্থীর পাশে বসে লিখতে সাহায্য করছে। পরীক্ষার্থী নকল দেখে লিখতে গেলে সময় চলে যাচ্ছে। ফলে কেউ পড়ে শোনাচ্ছে— পরীক্ষার্থী লিখছে। পাঠক বাক্য শেষ করে বলছে, 'ফুলস্টপ'। লেখক জিজ্ঞেস করছে, 'বানান কী বল?' পাঠক বলে দিচ্ছে, 'কলমটা চেপে ধর, ব্যস— এবার উঠিয়ে ফেল।' আগে ফাইভ-পাস করা ছিল, একটু লিখতে-পড়তে পারে এমন সবাই ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের জন্য অপেক্ষমাণ, যেন হন্যে হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর পরীক্ষার মেলা বসে। ফ্রি খাওয়া একবার শুরু হলে সহজে আর শেষ হয় না। আবার শেষ হলেও রয়ে যায় অবশেষের রেশ।

এলাকায় রক্ষীবাহিনী আসা শুরু করে দিয়েছে। যুবলীগের নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন গ্রাম ঘিরে অনেককেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যাকে ধরে নিয়ে যায়, সে আর সাধারণত ফিরে আসে না। কদাচিৎ ফিরে আসে। থানা ও মহকুমা পর্যায়ে

টর্চারিং সেল তৈরি হয়েছে। এতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। রক্ষীবাহিনী যাকে খুশি ধরে নিয়ে যায়। দু-চার দিন পর তার লাশ কোনো এক রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়, অথবা কোনো জলাধারে ভাসতে দেখা যায়। অনেকের লাশ খুঁজে পাওয়া যায় না। একেবারে বেমালুম গায়েব। কে যে কখন কোন ক্ষমতায় কার নামে রিপোর্ট করে কাকে ধরিয়ে দেয়, বোঝা কঠিন। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব। সাধারণ মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত। উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। কানকথা ও হুজুগ বেশি রটে। একজন এসে বললো, 'শুনেছি, তোর নামে রিপোর্ট আছে', ব্যস— পালানো শুরু হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ উভয় সংকটে। অনেকেই রাতে মাঠে পালিয়ে থাকে। রাতে এসে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে একদল খেতে ও ঘরে থাকতে চায়, কাউকে বলতে নিষেধ করে। জীবন বাঁচাতে হলে থাকতে দিতে হয়, ঘর ছেড়ে দিতে হয়, খেতে দিতে হয়। কখনো নাম বলে 'সর্বহারা', কখনো 'গণবাহিনী', কখনো-বা অন্য কোনো বহুল-ব্যবহৃত চেনা নাম। এরপর 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা,' রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার— 'ভাত দিলি কেন, বল? থাকতে দিলি কেন, বল? তুইও ঐ দলের লোক। চল টর্চারিং সেলে চল, তোকে চৌদ্দ শিকেয় ঝুলাবো।'

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পলিসির অপপ্রয়োগও শুরু হয়ে গেল। আমাদের পাশের থানার একটা ঘটনা এরকম:

যুবলীগের এক মধ্যম-সারির নেতার বউ বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে চলে গেছে। স্বামীর ঘরে আর আসতে চায় না। নেতা ক্ষমতার জোরে দলবল নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বউকে জোরপূর্বক ধরে টর্চারিং সেলে আনতে চাচ্ছে। শহরের রাস্তা দিয়ে দু-হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। বউয়ের শাড়ি খুলে কোথায় চলে গেছে তার খোঁজ নেই। পাকা রাস্তার ঘর্ষণে সায়াটাও অর্ধছিন্ন— বিবস্ত্রপ্রায়, গায়ে ব্লাউজ— অক্ষত। রাস্তার দু ধারে লোকজন দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কারো সামনে আসার সাহস নেই, কোনো টুঁ-শব্দও নেই। একজন মুরুব্বি গোছের লোক দোকানের সামনে বেঞ্চের উপর বসে আছেন। তিনি বিনীতভাবে বলেছেন, 'এভাবে বিবস্ত্র অবস্থায় একজনকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ধরে না-নিয়ে গেলেই কি নয়? বাড়িতে মা-বোন তো সবারই আছে, তোমরা বাবা ওকে উঠিয়ে নিয়ে যাও।'

দলবল এবার মুরুব্বিকেও যাচ্ছেতাই বলে গালিগালাজ করলো। মেয়েটার সাথে তাঁকেও টর্চারিং সেলে নিয়ে গেল। মুরব্বিটা পরে আর ফিরতে পেরেছিল কিনা তা খোঁজ নেয়ার অপেক্ষা।

মানুষ ভীতবিহ্বল। কোথায় গিয়ে লুকাবে! কে কার নামে কীভাবে রিপোর্ট করছে— তা সবার অজানা। আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ নিষ্ক্রিয়। কোথায় বিচার! কোথায় আইন-শৃঙ্খলা! কোথায় জীবনের আশ্রয়!

অনেক কথাই কানে আসে। আমার বিরুদ্ধেও নাকি রিপোর্ট চলছে। জমি-দখলকারী পক্ষ যুবলীগের সাথে মিলে রক্ষীবাহিনী নিয়ে মাঠে নেমেছে। আমার গায়ে এবার বামপন্থীর রং লাগানোর চেষ্টা চলছে। রক্ষীবাহিনীর ধরে-নিয়ে-যাওয়া কারো মুখ দিয়ে আমার নামটা একবার উচ্চারণ করাতে পারলেই হয়।

আমার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। আমি কোথায় গিয়ে লুকাবো! কে আমাকে দেবে একটু আশ্রয়! আমার তো উভয় সঙ্কট। 'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ'। এটাই আমাদের অতিকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ, সোনার বাংলাদেশ।

আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষ। কোনো পক্ষের হাত থেকেই রক্ষা পাওয়ার পথ নেই, পালানোরও জায়গা নেই, কোনো ভরসা নেই। বড়জোর ক্ষেতের আড়ালে গিয়ে মুখ লুকানো। ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা জীবন বাঁচানোর তাগিদে শহরে গিয়ে রক্ষীবাহিনীর সুরক্ষায় জীবনযাপন করছে। আমরা তো সাধারণ মানুষ, কোনো 'বাদ'-এ নেই, প্রতিবাদও নেই। না মুজিববাদ, না লেলিনবাদ, না মাওবাদ। পাটা ও শিলের মাঝখানে পড়ে বাটনা বাটার মশলা। উভয় অপশক্তির মাঝে পড়ে কাতরানো অসহায় জনগোষ্ঠী— সব সময় ভয়ে থরহরি কম্পমান। 'ঐ বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়, পাখি কখন জানি উড়ে যায়।'

গ্রামের অনেকেই গোপনে মাঠে পালিয়ে থাকে শুনেছি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ধরলাম। মাঠে থাকলে মাঠেই নামাজ পড়ি। সময়-সুযোগ বুঝে গোপনে কোনো মসজিদে গিয়ে মোনাজাত করি, 'আল্লাহ, তুমিই রক্ষাকারী, তুমি ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই, অকূল পাথারে খোদা তুমিই ভরসা মম'।

বেশ কিছুদিন সুদূরীর সাথে দেখা নেই। তার সুখস্মৃতি নিয়ে আশায় বুক বেঁধে জীবন-মৃত্যুর সাথে যুদ্ধে নেমেছি। সারাদিন এদিক-ওদিক ক্ষেতের মধ্যে থাকি,

রাত হলে কোনো কবরস্থানে কিংবা গাঙ-পাড়ের শ্মশানে চলে যাই। অন্ধকার রাতেও সাপ-বাঘের ভয় মনে আসে না, ভূত-প্রেতের ভয়ও না। মনে শুধু মানুষের ভয়। কোনো মানুষ আসতে দেখলেই ভীত হয়ে পড়ি। ঝরা পাতার শব্দও শঙ্কিত করে তোলে, সেদিকে কান খাড়া করি। সাথী একজনই— সেলিম ভাই। আমি সেলিম ভাইকে কোনো গ্রুপের সাথে হাত মেলাতে নিষেধ করেছিলাম। সে হেসে বলেছিল, 'টিকে থাকতে হলে এ-সময়ে কোনো-না-কোনো গ্রুপের সাথে যোগাযোগ থাকা ভালো।'

সেদিন রাতে বিলের ধারে এক খড়ক্ষেতের মধ্যে বস্তা পেতে বসে আছি। বেশ রাত। হঠাৎ মাঠের এক প্রান্ত থেকে দুটো গুলির শব্দ কানে এলো। সতর্ক হলাম। একটু দূর দিয়ে রাস্তা গেছে, সেদিকে গাড়ির আলো দেখলাম। বুঝলাম, রক্ষীবাহিনী অপারেশনে যাচ্ছে। বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। খড়ক্ষেত ছেড়ে দুজনে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে ক্রমশ বিলের দিকে যেতে থাকলাম। বিলের পানিতে বোনা ধান। ধানগাছ সরিয়ে সরিয়ে ফাঁকা করে, ধানের মধ্যে ক্রমশ কোমর পানিতে গিয়ে এক আলের উপর আশ্রয় নিলাম। বুকটা ভয়ে ধড়ফড় করছে। এদিকে-ওদিকে ভীতসন্ত্রস্ত চাউনি। কোমর পানিতে কোমর পর্যন্ত বিলের জোঁকে সারা রাত রক্ত চুষে খাচ্ছে। বার বার ছাড়িয়েও জোঁকের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছিনে। জোঁক দেখলে এমনিতেই ভয় পাই। রক্ষীবাহিনী দেখলে পিলেই চমকে যায়, গুম হবার কথা মনে হয়। টর্চারিং সেলে পাঁচতলা দালানের উপর থেকে নীচে ছুড়ে ফেলে দেয়ার দৃশ্য মনে ভেসে ওঠে। গণবাহিনীর পুঁজিবাদের ধোঁয়া তুলে জমিজমার কোন্দলে জড়িয়ে নির্বিচার হত্যা আমাকে অসহায় করে তোলে। জীবনের এ-এক বিভীষিকাময় জীবন্মৃত অবস্থা।

বিলের ঐ জোঁকে-খাওয়া রাত আমাকে জীবনের চরমপন্থাকে বেছে নিতে বার বার উদ্বুদ্ধ করছিল। সকালে ভিজে লুঙ্গি পরে আখক্ষেত, পাটক্ষেত পেরিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। দিনের আলোর বাস্তবতা আমার চরমপন্থা বেছে নেয়াকে নিরুৎসাহিত করলো। সকালের খাবার খেয়ে আবার মাঠে চলে গেলাম।

সন্ধ্যায় দুজনে বাড়ি এসে খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি মাঠে চলে গেলাম। রাত অনেক হয়েছে। বিলের পাশের রাস্তায় দুটো গাড়ির আলো দেখলাম। গাড়ি দুটো শহরের রাস্তার দিকে যাচ্ছে। বুঝলাম, রক্ষীবাহিনী অপারেশন শেষে ব্যারাকে ফিরে

যাচ্ছে। ঐ রাতের মতো আস্থা ফিরে এলো। গাঙপাড়ের শ্মশানে আর গেলাম না। দুজনে আখক্ষেতের মধ্যে একটা গাছের নীচে রাত কাটিয়ে দেব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। ভাবলাম, রক্ষীবাহিনী কেবল অপারেশন শেষ করে আজকের মতো ব্যারাকে ফিরলো, আজ আর হয়তো ফিরে আসবে না।

ভোর হয়ে গেছে, সকাল হয় হয় অবস্থা। আখক্ষেত থেকে বেরোতেই দেখি রক্ষীবাহিনী সারা মাঠ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদেরকে থামতে বললো। আখক্ষেত, পাটক্ষেতের মধ্য থেকে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা বেরিয়ে আসতে লাগলো। আমার এলাকার যুবলীগের কোনো নেতা কিংবা পাতি-নেতাকে দেখলাম না। সবাই বলে, আমার চেহারা দেখে আসল বয়স বোঝা যায় না। দেখতে ছেলে-ছোকরা মনে হয়। রক্ষীবাহিনীর এক সদস্য আমাকে ছেড়ে দিল। সেলিম ভাইকে ধরে নিয়ে যেতে চাইল। সেলিম ভাই তার হাতের ঘড়িটা খুলে আমার হাতে দিল। যাবার সময় শুধু বললো, 'সজীব, এই হয়তো শেষ দেখা রে।' আমি চোখ মুছলাম। সেলিম ভাইকে ওরা নিয়ে গেল। আমি ওখান থেকে একটু সামনে এসে একটা পাটক্ষেতের মধ্যে ঢুকলাম। তারপর আবার বিলের পানিতে উঁচু আমন ধানের অগাধ বনে হারিয়ে গেলাম।

দুপুর নাগাদ আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বাড়িতে এলাম। শুনলাম, ওরা অনেককেই ধরে রাস্তার চৌমাথায় নিয়েছিল। তারপর ওদের মনমতো কয়েকজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেছে। কেউ কেউ বললো, চৌমাথায় গিয়ে কোনো এক নেতা নাকি আমার নাম বলেও খোঁজ করছিল। কথাগুলো শুনে আমি আবার মাঠে চলে গেলাম। পিছে ভয়, ওরা আবার যদি ফিরে আসে!

সেলিম ভাইয়ের সাথে যাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কেউ আর ফিরে আসেনি, কোনো খোঁজও নেই। শুরু হলো অপেক্ষার পালা। না-জানি দূরের কোনো জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আশা, একদিন ফিরে আসবে। এবার শুরু হলো উড়ো কথা শোনার পালা। কেউ বলে, না— তাঁকে অমুক জেলে একজন দেখে এসেছে। কেউ বলে, অমুক জায়গায় একটা লাশ কিছুদিন আগে পড়ে ছিল, দেখতে নাকি সেলিম ভাইয়ের মতো। বিভিন্ন জেলে, পথে-পথে, জলাশয়ে খোঁজাখুঁজি চলতে লাগলো। অন্তত লাশটা খুঁজে পাবার চেষ্টা। লাশের জন্য অপেক্ষা।

কোথাও লাশ পড়ে আছে শুনলেই সেখানে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করা। কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে— নিত্য আশা-দুরাশার দোলাচলে দোলা। এক বছর পর দুজন ফিরে এসেছিল, জেলে ছিল। বাকিদের লাশও পাওয়া গেল না।

সেলিম ভাইকে ধরে নিয়ে যাবার দিন থেকে সালামত চাচা ঐ-যে ঘরে ঢুকলেন, আর বেরোলেন না। দ্বীনদার মানুষ, ছেলেকে বামপন্থী দলের লোক বলে ধরে নিয়ে গেছে— এটা তাঁর লোকলজ্জা। আবার ছেলের শোক। ক্রমশই শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। চাচি ছেলের শোকে পাগলিনী প্রায়। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। লাশটা খুঁজে পেলেও হাতে করে কবর দেয়া যেত। কখনো খুব খারাপ লাগলে কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে কাঁদা যেত। নীরবে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকা যেত। মনের একটা সান্ত্বনা খোঁজা যেত। সেলিম ভাইয়ের একটা স্থায়ী ঠিকানা পাওয়া যেত। জীবিত মানুষকে মৃত ভেবে দোয়া করাটাও মনে সায় দেয় না। মনে এলোমেলো ঠিকানাহীন ভাবনা— এখন অনন্ত অপেক্ষা।

চাচি আমাদের বাড়িতে এসে বসে থাকেন। মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করেন। আমি মাঠ থেকে বাড়িতে ফিরে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোর সাথে কি আমার সেলিম রাতে মাঠে ছিল? তুই আসলি, আমার সেলিম আসলো না কেন?' কষ্ট মনে রেখে ভাবতাম, চাচি মনে হয় শেষতক পাগল হয়ে যাবে।

সালামত চাচা বিছানাগত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ছেলের জন্য নির্বাক অপেক্ষা করতে করতে কয়েক বছর পর নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর কয়েক দিন পর দূর থেকে শুনেছি। জানাজায় শরিক হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

মার কাছে শুনেছি, চাচি বাড়ি ছেড়ে বড় রাস্তার ধারে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে থাকতেন। সন্ধ্যায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকতেন। আমি বাড়িতে গিয়েছি শুনলেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'ও সজীব, তোর এখানে কি আমার সেলিম তোর সাথে খেলা করতে এসেছে? আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল, আমার সেলিম তোর সাথে বসে ছোটবেলার মতো খেলছে, তাই তোর কাছে জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

আমি কোনোদিনই তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারিনি। শেষে নিজেও চাচিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছি। কাঁদতে কাঁদতে কয়েক বছরের মধ্যে চাচির চোখ-জোড়া অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি বাড়ি গেলেই চাচির সাথে দেখা করতে যেতাম। আমাকে কাছে নিয়ে গায়ে হাত বোলাতেন। আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'তুই তো শহরে থাকিস, আমার সেলিমকে কি সেখানে দেখেছিস? একটু খুঁজে দেখিস তো। সেলিমের অপেক্ষায় আমার মন যে আর মানে না।' কখনো বলতেন, 'আমার মনে বলে, আমার সেলিম আজও বেঁচে আছে। তোরা দেখিস, একদিন এসে আমাকে মা বলে ডেকে উঠবে।' বুঝতাম, সেলিম ভাইয়ের জন্য চাচির আমৃত্যু অপেক্ষা।

আমি সেদিন থেকে আজ অবধি প্রায় রাতেই সেলিম ভাইকে স্বপ্নে দেখি। তার স্মৃতি আমার আজীবনের জপমালা। কখনো দু জনে খেলছি, কখনো দু জনে মাঠে পালিয়ে আছি, কখনো-বা অজানা কোথাও যাচ্ছি। কখনো কেউ পিছন থেকে গুলি করছে, মৃত্যুভয়ে দুজনে প্রাণপণ দৌড়াচ্ছি। কখনো দেখি, সেলিম ভাই জেল থেকে ফিরে এসেছে। আমাকে বলছে, 'জানিস, আমাকে অনেক দূরের জেলে পাঠিয়েছিল। তাই ফিরে আসতে এত দিন লেগে গেল। তোরা সব কেমন আছিস এবার বল?' কখনো সেলিম ভাইকে দাড়ি-পাকা হোমরা-চোমরা টুপিধারী অবস্থায় দেখি। আবার স্বপ্নেই ভাবি, আচ্ছা, বাম-রাজনীতিক সেলিম ভাই কি জেলে গিয়ে শেষমেশ দাড়ি রেখে বাম-রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে? রাত শেষে দিনের আলোয় সারাটা দিন মনটা খুব খারাপ থাকে। বাস্তবতায় ভাবি, আমি নিশ্চিত– সেলিম ভাইয়ের বিচার হলে বড়জোর কয়েক বছর জেল হতো, ফাঁসি হতো না। নিশ্চয়ই এতদিনে বাড়ি ফিরে আসতো।

এ কেমন অরাজক দেশ যে, বিনা বিচারে বেওয়ারিশ-ফাঁসি! এ কেমন দলীয় সন্ত্রাস যে, এখানে কোনো নাগরিকই নিরাপদ নয়! জীবনের নিরাপত্তা বলতে কোথাও কিছুই নেই। কারো কোনো কৈফিয়ত নেই, জবাব চাওয়া নেই। আমরা আবার এত কষ্ট করে এ কেমন স্বাধীনতা অর্জন করলাম?

কদিন বাদেই ভরসন্ধ্যায় সদর দরজা দিয়ে বেশ কজন লোক আমাদের বাড়িতে ঢুকলো। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। মা উঠোনে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা

কারা বাবা?' উত্তর এলো, 'আমরা গণবাহিনীর লোক।' তারা সরাসরি আমার ঘরে ঢুকতে গেল। নিশ্চয়ই তারা কোথাও থেকে সংবাদ পেয়েছে, আমি বাড়িতে আছি। আমি রান্নাঘরের ভিতর বসে ভাত খাচ্ছিলাম। খেয়েই মাঠে চলে যাবার কথা। মা বার বার তাগাদা দিচ্ছিলেন, 'সন্ধ্যা নেমে আসছে, তুই বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যা।' রান্নাঘরের একপাশ দিয়ে বাইরে বেরোনোর ব্যবস্থা করে রাখা ছিল। বেড়াটা ধাক্কা দিয়ে, ওদিক দিয়ে বেরিয়ে, বাঁশবাগান পেরিয়ে প্রথমে নাটা বনে আশ্রয় নিলাম। রাত বেড়ে গেলে ওখান থেকে বেরিয়ে গাঙপাড়ের কবরখানায় গিয়ে কাটালাম। কবরের কঙ্কালের ভয় নেই, রাতে ভূত-প্রেত সাপ-বাঘের ভয় নেই, জীবিত মানুষ দেখলেই যত ভয়।

পরদিন সকালে, বেলা ওঠার আগেই বাড়িতে এলাম। মা বললেন, 'তুই বাড়িতে এসেছিস কেন? এখানে আর কিছুদিন থাকলে নির্ঘাত মারা পড়ে যাবি। এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যা। শহরে কিংবা যে দিকে খুশি অন্য কোথাও চলে যা। এখান থেকে পালা। বাড়িতে আর সহজে আসিসনে।'

মাঠের মধ্য দিয়ে এসে গাঙ পেরিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকলাম। সামনের পাকা রাস্তায় গিয়ে উঠলাম। বাড়ি থেকে ত্রিশ মাইল দূরে পুরোনো এক জেলাশহরে গিয়ে এক আবর্জনাময় গলির পাশে একটা নামমাত্র ভাড়া-করা রুমে আশ্রয় নিলাম। অবর্জনাময় গলি হওয়ায় সহজে মানুষের চোখ পড়ে না। ভালো কোনো লোকজনও এ-গলিতে বাস করে না।

শহরে থাকতে বাসা ভাড়া ও পকেট খরচ বাবদ নগদ টাকা লাগে। সহজে বিক্রিযোগ্য সম্পদ যা ছিল, যুদ্ধে লুট হয়ে গেছে। মাঠে নামমাত্র ক বিঘে জমি, যার উপর আবার প্রতিপক্ষের নজর পড়েছে। নগদ টাকার বড্ড অভাব। তার উপর দ্রব্যমূল্য বেশ চড়া— দেশে খাদ্যাভাব। ওখানে খেয়ে না-খেয়ে এক মাস কাটালাম। কিন্তু এভাবে আর কদিন। ওখান থেকে আরো দূরে দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়বাড়িতে যোগাযোগ করলাম। সেখানে গিয়েও বেশ কিছুদিন কাটালাম।

রাতে শুয়েও ঘুম নেই। দুটো চোখ বুজে এলেই কোথাও না-কোথাও একটা খট করে শব্দ। ঘুমের ঘোরে আচমকা ধড়ফড় করে উঠে বসি। এদিক-ওদিক সন্ত্রস্ত হয়ে তাকাই। বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যায়। মনে হয়, কেউ যেন আমাকে ধরতে

এসেছে, মারতে এসেছে– হয়তো চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন অবস্থা হয়, ঠিক তেমনই।

সুদূরীর জন্য মনটা উথলে ওঠে। কোনো খোঁজ নিতে পারিনে, খোঁজ দিতেও পারিনে। বেওয়ারিশ এক নিরুদ্দিষ্ট পলাতক জীবন। অনেক রাতেই শুয়ে শুয়ে প্রতিজ্ঞা করি। অস্ত্র হাতে নেব, প্রতিপক্ষের প্রতিশোধ আমি নেবই। মরলে মরবো, আপত্তি নেই।

দিনের আলো এলেই বাস্তবতা বিবেচনায় প্রতিজ্ঞা কীভাবে যেন ভেঙে যায়। ভাবি, কতই তো দেখলাম! ও-পথ অন্ধ-গলিপথ, এক মুখ বন্ধ। ও-পথে ঢোকা যায়, বেরোনো যায় না। ও-পথে গেলে নির্ঘাত অপমৃত্যু।

দু-তিন মাস পর পর হঠাৎ একবার মাকে দেখতে রাতের অন্ধকারে বাড়ি আসি। মা-র সাথে দেখা করে মাঠে রাত কাটাই। আবার আড়ালে আড়ালে ফিরে চলে যাই। আসার পথে স্কুলের পাশের ছোট্ট সেই বাজারের কোনো এক দোকানে ঝাঁপের নীচে স্কুলের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকি। মনে আশা, যদি সুদূরীকে দূর থেকে হলেও এক ঝলক দেখতে পাই। কিন্তু না। সময় শেষ হলে গন্তব্য পথে চলে যেতে হয়।

হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষা চলে এসেছে। ফরম পূরণ করতে হবে। একদিন এসে ফরম পূরণ করলাম। সুদূরীকে দূর থেকে দেখলাম, কথা হলো না। সুদূ, আমার সুদূ। কত কাছের সেই সুদূকে শুধু দূর থেকে দেখা, কাছে ডেকে কথা বলার অধিকার নেই। রক্ষণশীল সমাজ। অব্যক্ত কথা মনে মনে গুমরে মরতে লাগলো। ইচ্ছে করে সামাজিক এ রীতিনীতি, বেষ্টনীর এ আগল ভেঙে বেরিয়ে আসি। সবাইকে চিৎকার করে বলি, 'আমার সুদূকে আমি চাই, তার সাথে মন খুলে কথা বলতে চাই। সুদূর সাথে আমার কথা বলায় কেন এত বাধা?' কিন্তু কেন যেন পারিনে, চুপ হয়ে যাই। লোকলজ্জা, সমাজ আমার বাধা। সমাজ আমার মনের ভাষা বোঝে না।

হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষার দিন ক্রমশই ঘনিয়ে আসতে লাগলো। শহরের এক স্কুলে সিট পড়লো। পরীক্ষা দিলাম। নিজেই বুঝলাম, পাস আমার হবে না। ও নিয়ে আমি বেশি ভাবিওনে। মনে আশা, পরিস্থিতি একটু শান্ত হলেই সুদূকে ঘরে তুলে নেব। গ্রাম ছেড়ে শহরে নিয়ে আসবো। কোথাও একটা ব্যবসা শুরু

করবো। একটা ছোট্ট সংসার হবে। সেখানে থাকবো শুধু আমি আর সুদূ। মাকে শহরে নিয়ে আসবো। সুদূকে সাথে নিয়ে জীবনটা শহরেই কাটিয়ে দেব। গ্রামে জমির উপর ভরসা-করা জীবনযাপন আর করবো না। ওতে সামাজিক দ্বন্দ্ব, আর মৃত্যু নিয়ে খেলা।

বাম রাজনীতি অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্রমশই বহুধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। রাজনীতি আদর্শচ্যুত হতে চলেছে। এলাকার দলনেতারা ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা কোনো গোষ্ঠীবিবাদে জড়িয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ফন্দি তৈরি হয়েছে। এমনই একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গেল—গ্রুপভিত্তিক, এলাকাভিত্তিক রাজনীতি। যে-গ্রুপ যে এলাকা দখল করে নিতে পারে, সেই-ই সেখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। গ্রুপে গ্রুপে মারামারি, রেষারেষি। নিজেদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি। পরিণামে কারো মৃত্যু।

কেউ-কেউ সামাজিক রেষারেষির কারণে, কেউ-বা জীবন বাঁচানোর তাগিদে, আবার কেউ প্রতিশোধ নেবার জন্য গোপন সংগঠনে যোগ দেয়। অস্ত্র সংগ্রহ করে। নেতা হবার জন্য রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলে, শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলে। গোপন দলের বড় নেতা হয়। কিছুদিন পর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে, কখনো প্রতিপক্ষের ছোবল খেয়ে লাশ হয়ে মাটিতে মিশে যায়।

আমাকেও অনেকে কোনো-না-কোনো গোপন সংগঠনের সাথে মিশে শক্তি সঞ্চয়ের পরামর্শ অনেকবার দিয়েছে। এভাবে জীবন বাঁচানোর কথা বলেছে।

সাত

শহরের এক কলেজে ভর্তি হয়েছি। লেখাপড়া করার মতো মনও নেই, পরিবেশও নেই। ভর্তি হয়েছি শখের বশবর্তী হয়ে। এ-পড়া শখের পড়া, সময় পার করার পড়া। ভবিষ্যতে অন্তত বলতে পারবো, আমি কলেজে পড়েছি। শহরে দুটো টিউশনি জোগাড় করে নিয়েছি।

কখনো সময়-সুযোগ বুঝে ডায়েরিটা হাতে নিয়ে কলেজে যাই। পড়ায় মন বসে না। সুদূরীর অনুপস্থিতি খুবই অনুভব করি। বার বার ভাবি, সুদূরী যদি কলেজে পড়তে আসতো তাহলে আমারও প্রতিদিন আসা হতো। দেখা হতো, কথা হতো। জীবনটা নিশ্চয়ই অন্য রকম হতো।

অনেক দিন পর পর গোপনে মাকে দেখতে গ্রামে আসি, আবার চলে যাই। আসা-যাওয়ার পথে গাঙপাড়ের রাস্তার দিকে উদাসী দৃষ্টিতে তাকাই। মনটা সুদূরীকে খুঁজে ফেরে। চলতি পথে স্কুলের দিকে তাকাই, করবী গাছটার দিকে তাকাই, কোথাও সুদূরী নেই। যখন পথে হাঁটি মনে হয়, কখন না-জানি সুদূরী কোনো গাছের আড়াল থেকে পিছনে এসে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে আমাকে চমকে দেবে। একটা দোকানে বসি— সেখান থেকে স্কুলের গেট দেখা যায়। মনে ভাবি, সুদূরী হয়তো স্কুল শেষে এ-পথেই যাবে। দেখা হবে, কথা হবে। কিন্তু না, মনে হয় চারদিক শূন্য। কোথাও কেউ নেই। শুধু পড়ে আছে বেদনার দহন আর স্মৃতিরেখা।

একবার ভাবলাম, সুদূরীদের গ্রামে একদিন যাব। বাড়ির পাশ দিয়ে যাব। হয়তো দেখা হয়ে যাবে। মনে বড় সংকোচ, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এ গ্রামে কেন এসেছো', কী উত্তর দেব?

স্কুলের পাশে ছোট্ট বাজারটার একটা দোকানে বসে আছি। এক সহপাঠী এসে কথায় কথায় সুদূরীর কথা উঠালো। বললো, 'সুদূরী তোমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তোমাকে সে ভুলে গেছে। কিছুদিন জানে আলমের সাথে বেশ মাখামাখি করতো। হেসে হেসে কথা বলতো। 'চাচামিয়া'কে ঘিরেও কিছু রটনা আছে। তুমি চলে যাবার পর শাহীনের এক আত্মীয়ের কাছ থেকেও সে ফুলের তোড়া নিয়েছিল।

তাকে নিয়ে অনেক কথা। এসব কথা সুদূরীর বাড়িতেও গিয়েছিল। সুদূরীর চলাফেরা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বাড়িতেও অশান্তি। স্কুলের সবাই তা জানে। বাড়ি থেকে সুদূরীর স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।'

ভাবলাম, আমি স্কুল থেকে চলে আসার পর বয়সের চঞ্চলতায় তার কি প্রেমের প্রবল নেশায় ধরেছিল? সে কি আবেগের আতিশয্যে যাকে যেখানে পেয়েছে তাকেই বাচবিচার না করে আঁকড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছিল?

মনটা খারাপ হলো বটে, কিন্তু সহপাঠীর কথায় কোনো উত্তর দিলাম না। হতোদ্যম হয়ে শহরের সেই বদ্ধ-গলির ঘরটাতে ফিরে এলাম। মন কোনো বুঝ মানতে নারাজ। নির্ঘুম রাত কেটে যায়, দিন চলে যায়। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলি।

মৃত্যুর সমন উপেক্ষা করে মা ও সুদূরীর টানে অনেক দিন পর সহসা এলাকায় আসি। এসে যখন শুনি, সুদূরী আর আমার নেই, ভাবতেই বুকটা ফেটে যায়। মনে অবিশ্বাস জন্ম নেয়। যার প্রতি মমতা যত বেশি, তার বিচ্ছেদের কথায় আঘাতও তত বেশি। "তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব– ... । যতবার পরাজয় ততবার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে, সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে'?"

শরীরের প্রতি অনাদর, অবহেলা, অনিদ্রার ফলে স্বাস্থ্যে ধস নামলো। দিনে দিনে চোখের কোণে কালো দাগ পড়লো। বদ্ধ ঘরেই বেশির ভাগ সময় শুয়ে কাটাই। স্কুলের পাশে বাজারে আসা কমে গেল।

এক সকালে লোকমুখে শুনলাম, আমাদের জাতীয় নেতা শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হয়েছেন। রক্ষীবাহিনীর দুঃসহ শাসন ও নির্বিচার হত্যার অবসান হয়েছে। খবরটা শুনে মর্মাহত হলাম। আবার রক্ষীবাহিনীর মৃত্যুভয় থেকে নাজাত পেলাম ভেবে ভালোও লাগলো। অনেক মানুষকেই আনন্দ করতে দেখলাম। অনেক সচেতন মানুষকে শোকাতুর মনে হলো। আমাদের গ্রামের ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই, করিম নানার অনুভূতি জানা হলো না। ভাবলাম, উদার মনের প্রশাসন-নির্লিপ্ত একজন দরদি নেতা তাঁর স্বগতোচ্চারিত 'চাটার দল', লুটেরা স্বজনদের পাপের প্রায়শ্চিত্তও নিজের জীবন দিয়ে করে গেলেন। বার বার ভাবতে লাগলাম, তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যে, এ দেশের যে কোনো মানুষকে তিনি দিনের পর দিন কোথাও বসে থাকতে বললে, সে নির্দ্বিধায় তা পালন করবে। না-খেয়ে দিন কাটাতে বললে, মানুষ

তাই করবে। কোনো দেশ গড়তে গেলে এমন একজন জনপ্রভাবশালী নেতাই তো দরকার। এমন একজন স্বদেশপ্রেমী অবিসংবাদিত নেতা দেশ চালাতে ব্যর্থ হলেন। শেষে জীবন দিলেন। দেশ গড়ার এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

দুই চরমপন্থী বাহিনীর মধ্যে এক বাহিনীর অধ্যায় শেষ হলো, কিন্তু আমার পিছনে লেলিয়ে দেয়া গণবাহিনী, সর্বহারা বাহিনীর তো কোনো পরিবর্তন হলো না। অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পরোয়ানা রয়ে গেল। দেশে আইনের শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা না-হলে এ দুর্বিপাক থেকে জনমানুষের মুক্তি নেই। এখন শুধু অপেক্ষা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া এবং শান্তি ফিরে আসার।

একদিন সেই ছোট্ট বাজারের একটা দোকানে বসে আছি। সুদূরীর সাথে যোগাযোগের একটা পথ খুঁজতে এসেছি। হাসিব ভাইয়ের সাথে দেখা। সে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে থামলো। হাসিব ভাইয়ের বাড়ি সুদূরীদের গ্রামে। হাসিব ভাইয়ের বোনের সাথে সুদূরীর সখ্য। সুদূরী ওদের বাড়িতে যায়। হাসিব ভাই আমাদের স্কুলেই পড়তো। আমার দু বছরের বড়। তার সাথে একসময় বাজারের মধ্যে মার্বেল খেলতাম আমাকে ডেকে বাজারের ভিতরে নিয়ে গেল। আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলো। বর্তমানে কোথায় থাকি, কী করি— তাও জানার চেষ্টা করলো। কথায় কথায় সে বললো, তার সাথে সুদূরীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিছু ঘটনাও বললো। সে সুদূরীর হাতে-লেখা চিঠি প্রয়োজনে আমাকে দেখাতে পারে, তাও বললো।

আমার সাথে সুদূরীর সম্পর্ক আছে কী নেই, ধরা দিল না। কথা শেষে সিনেমার একটা বিরহের গান গুন গুন করে গাইতে থাকলো। বুঝলাম, সে হয়তো সুদূরী ও আমার সম্পর্কের কথা কোথাও শুনে থাকবে। আমি যেন আর সামনে না-এগোই, সেজন্য এ-তথ্য আমাকে জানালো। চিঠিও দেখতে চাইলাম না। মনটা আরো ভেঙে গেল।

হাসিব ভাই আসলেই আমার থেকে দেখতে অনেক সুন্দর, গোলগাল গঠনের ফর্সা চেহারা। তার দিকে তাকালে আমারও তার মতো হতে ইচ্ছে হয়।

সুদূরীর সাথে দেখা করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। একদিন বিকেলে ওদের গ্রামে গেলাম। ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেলাম। ঘরের জানালার দিকে বার বার তাকালাম। কাউকে চোখে পড়লো না। দেড় শ-দু শ গজ দূরে দেখলাম, রাস্তার

পাশে একটা বকুল গাছ, পাশে ভলিবল খেলা হচ্ছে, সেখানে একটু দাঁড়ালাম। পরিচিত দু-তিনজনকে পেলাম, খেলায় অংশ নিলাম। বার বার সুদূরীদের বাড়ির দিকে তাকাচ্ছি। ভাবছি, ও যদি কোনো কাজেও বিকেলে বাড়ির বাইরে বের হয়, দেখা হয়ে যাবে। কেউ বেরোলো না। খেলা শেষে ওদের বাড়ির ধার ঘেঁষে রাস্তা ধরে আবার ফিরে এলাম। বার বার তাকালাম, দেখা হলো না। এ দিন আমার একটা কাজ হলো। ওদের বাড়িতে ছোট কাউকে পড়াতে যায় এমন একটা ছেলের নাম আমি পেলাম, যাকে আমি চিনি।

ঐ দিন কানাগলির সেই রুমটাতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। নিজেকে কেন জানি ব্যর্থ-প্রেমিক মনে হতে লাগলো। হতাশায় জীবনটা ভরে গেল। বিরহ-বিধুর গানগুলো খুব প্রিয় হতে লাগলো।

আমি এসব কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য হলেও সুদূরীর সাথে অন্তত একবার দেখা করার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঘর বাঁধার স্বপ্ন তখন দূরে চলে গেছে। আমি নিজেকে ব্যর্থ ভাবতে শিখেছি। হতাশার চাদর আমাকে ঢেকে দিয়েছে। শোনা কথায় সুদূরীর প্রতি অবিশ্বাস ক্রমশই দানা বাঁধছে। সুদূরী আমার সাথে ছলনা করেছে বলে মনে বিশ্বাস জন্মেছে। হাসিব ভাইয়ের চেহারা আমাকে ঈর্ষান্বিত করছে। যেভাবেই হোক ওর সাথে একবার দেখা হবার অপেক্ষা। কিছু প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা।

কখনো মনে হতো, এ তো ওর বিরুদ্ধে অপবাদও হতে পারে। দেখাটা করতে পারলেই সবকিছু বোঝা যাবে।

কখনো-বা সুদূরীর প্রতি অভিমান হতো। ভাবতাম, একটা মেয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকলে আমি তার সাথে যোগাযোগ করবো কী করে? আবার ভাবতাম, সে-ও তো আমার সাথে যোগাযোগের একটু চেষ্টা করতে পারে। তার হাতে যোগাযোগের একটা সুযোগ আছে বলে আমি জানি। সে কেন চুপচাপ বসে আছে? তাহলে সে কি সত্যি সত্যি আমাকে ভুলে গেছে?

একবার তার ঠিকানায় চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম। পাছে চিঠিটা অন্য কারো হাতে পড়ে, এই ভয়ে আর লেখা হয়নি।

ওদের বাড়িতে টিউশনি-করতে-যাওয়া ছেলেটা বাজারের পাশের গ্রামে বাস করে। একদিন ওর সাথে দেখা করতে ওদের বাড়িতে গেলাম। কথায় কথায় মনে হলো, ও

আমার ও সুদূরীর সম্পর্কটার কথা জানে। তাকে কিছু কথা সুদূরীকে জিজ্ঞেস করতে বললাম। সে রাখঢাক না করে সোজাসুজি বললো, 'সজীব ভাই, অতীতকে ভুলে যাওয়াই ভালো।' আমার কোনো চিঠি নিতেও সে অপারগতা জানালো। বুঝলাম, হয়তো সে ভেবে থাকতে পারে যে, যদি আমার কোনো কারণে তার টিউশনিটা হাতছাড়া হয়ে যায়, তো তার অনেক অসুবিধে হবে। নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম।

মনে সন্দেহ আরো দানা বাঁধলো। মনে হলো, সে সুদূরীর কী এমন ঘটনা জানে যে, আমাকে অতীত ভুলে যেতে বললো? এলাকায় আসা কমে গেল। শহরের আবর্জনার স্তূপে ভরা সেই গলিটার পাশে অন্ধকার একটা রুমে নিঃসঙ্গ বসবাস করতে থাকলাম। এ অপেক্ষার শেষ কোথায় তখনও জানিনে। বাড়িতে বিধবা মা আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। ছোটবেলায় বাপকে হারিয়েছি। শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মা-আমার বেঁচে থাকার স্বপ্ন খুঁজছেন, জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে সাথে নিয়ে মা নতুন করে সংসার করতে চান।

পকেট ভারী না হলে শহরে জীবনযাপন করা কঠিন। আমার আয়-রোজগার নেই। আবার এলাকায় ফিরে এসে শান্তিতে থাকবো, কিছু একটা করে খাবো, তাও হবার নয়। শহরে ব্যবসা করবো— পুঁজি নেই।

মনে হলো, লেখাপড়া শিখলে না-হয় ছোটখাটো একটা চাকরির সন্ধান করা যেত। বড় শহরে যাওয়া যেত। সে পথও তো প্রায় শেষ। সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রস্তুতি একেবারেই নেই। সময়ও অল্প।

কলেজের এক বন্ধুর সহযোগিতা নিয়ে কিছুটা হলেও পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম। পিছুটান শুধু মা, সুদূরীর ডাগর চোখের স্মৃতিভরা ইশারা, তাকে হারানোর অজানা ব্যথা, আর আমার একবুক নীরব কান্না। সুদূরীর সাথে দেখা হওয়া ছাড়া ঘর বাঁধার স্বপ্ন শূন্যে উড়ে গেল।

আরো বড় শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। টিউশনি করি। মা-র সাথে চিঠিতে যোগাযোগ করি। মা মাঝেমধ্যে কিছু টাকা পাঠান। গ্রামে যাওয়া হয় না বললেই চলে। কাদাচিৎ গেলেও রাতে বাড়িতে থাকিনে। প্রতিপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কথা শুনে আরো সক্রিয়।

প্রগতিশীল বাম রাজনীতির গোপন সাংগঠনিক ধারা বলতে গেলে স্তিমিত হয়ে গেছে। আদর্শ বলতে আর কিছুই নেই। এলাকায় বিভিন্ন সক্রিয় রাজনৈতিক

গোষ্ঠীর নেপথ্য অস্ত্রশক্তি হিসেবে টিকে আছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে, বিভিন্ন পেশার মানুষের কাছ থেকে, স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কাজের চেয়ারম্যান ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্য ত্রিপক্ষীয় জোট গড়েছে। এতে আছে রাজনীতির প্রভাবশালী পক্ষ, আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনী, আর এই স্রোতহারা, দিগ্‌ভ্রান্ত, অস্ত্রধারী রাত-চরা গোপন বাহিনী। কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই বিভিন্ন ডান-দলে তোষামোদকারী হিসেবেই ভিড়েছে। বামদলে নাম লেখানো সম্ভাবনাময় মেধাবী তরুণেরা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ব্যক্তিজীবনের ভবিষ্যৎ হারিয়ে হতাশার চাদরে মুখ ঢেকেছে। কেউ-বা পথ হারিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদাবাজির পথ ধরেছে। শেষে স্বার্থের কোন্দলে জড়িয়ে লাশ হয়ে মরাকাটা ঘরে গেছে।

কিন্তু এ প্রবাহ নিঃশেষ হবার নয়। যার হাতে যখন অস্ত্র আসে, অস্ত্রের শক্তিতে সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে কথা বলতে চায়, আন্ডারওয়ার্ল্ডের বড় নেতা হয়ে যায়। কিছুদিন টিকে থাকে, তারপর মরাকাটা ঘরে ঢোকে, পত্রিকায় সংবাদের শিরোনাম হয়। জনসমক্ষে আসল পরিচয় ও নেতা হবার নেপথ্য ইতিহাস বেরিয়ে আসে। দেশে আইন ও বিচারহীনতার এই তো যথার্থ পরিণতি। পত্রিকায় এসব খবর পেলে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি, আর মনে মনে বিশ্লেষণ করি।

কখনো বাড়িতে গেলেই সালামত চাচার বাড়িতে যাই। অন্ধ চাচির সাথে দেখা করি। চাচি আমার গলার আওয়াজ শুনলেই হাত বাড়িয়ে কাছে নেন। শেষমেশ আমার হাত তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘ও সজীব, তুই সত্যি করে বল তো, আমার সেলিম কি আজো বেঁচে আছে? কবে সে বাড়ি আসবে? আমার তো আর ধৈর্য ধরে না। সে তো বুঝতে পারছে না যে, দিনে দিনে আমার মরার সময় হয়ে গেছে। তার সাথে আমার দেখা যে আর হলো না। তুই একটু খোঁজ করে দেখিস তো।’

আমি তাঁর পাশে কিছুক্ষণ বসে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসি।

কৈশোর থেকে যৌবনের এ প্রারম্ভ পর্যন্ত— জীবনের নির্মম বাস্তবতার ঘা খেয়ে মনের মধ্যে শুধু দুটো অপেক্ষার জন্ম নিয়েছে। এক. পারস্পরিক হানাহানি-বিদ্বেষহীন, ন্যায়বিচার এবং শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থায় শান্তিতে বসবাসের অপেক্ষা; দুই. সুদূরীকে সাথে নিয়ে দুজনে জীবন-পথ চলার অপেক্ষা।

আট

এলাকার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রায় হারিয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে কেউ চিঠি লিখলে খোঁজখবর পাই, নইলে না। বড় শহরে এসে শহরের নিয়ম-কানুন, হাঁটা-চলা, সৌজন্য আবার নতুন করে শিখতে হচ্ছে। চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসছে। শহরের পরিবেশের সাথে মোটামুটি খাপ খাইয়ে নিয়েছি। দেখছি, গ্রামের ঐ প্রতিহিংসাপরায়ণ, মৃত্যুভয়ে পালিয়ে থাকা জীবনই শুধু জীবন নয়। জীবনটা অনেক বৃহৎ, এর পরিধি অনেক ব্যাপক, সারা বিশ্বটাই মানুষের দখলে। লেখাপড়া শিখে বড় হতে চাইলে পথের অভাব নেই।

কখনো বাড়িতে যেতে চাই— দূরের পথ। পথে দু-বার ফেরি পারাপার। আরিচা ঘাট পেরোতে পারলে যত দেরিই হোক, বাড়িতে পৌঁছানোর আশা ফিরে পাই। পথ-ঘাটের বেহাল অবস্থা। কখনো ছ টার গাড়ি ন টায় ছাড়ে, কখনো-বা ন টার গাড়ি ছ টায়। আরিচা ঘাট থেকে নদী পার হলে ওপারে দৌলতদিয়া। মাঝে পদ্মা। কখনো উন্মত্ত, কখনো-বা ধু-ধু বালির বিরান প্রান্তর। দৌলতদিয়া থেকে টেম্পু বা রিক্সা-ভ্যানে গোয়ালন্দ পৌঁছাই। তারপর অধিকাংশ সময়ে বাসে চড়ে ফরিদপুরের মধ্য দিয়ে যশোরের রাস্তা ধরি। গোয়ালন্দ গিয়ে কপাল ভালো হলে মাঝেমধ্যে খুলনাগামী লোকাল ট্রেন পাই। ট্রেন ঢুকুর-ঢুকুর করতে করতে কবে নাগাদ যশোর পৌঁছোবে তার কোনো সময়সীমা থাকে না। তবু সুযোগমতো ট্রেন ধরি। ভাড়া অল্প, একবার চড়ে বসতে পারলেই ‘চললো ঘোড়া মধুপুর’।

উপেক্ষিত অঞ্চল, উন্নয়নের ছোঁয়া কোথাও নেই। বাসে চড়ে কামারখালি ঘাট পর্যন্ত যেতে রাস্তার দু পাশের গাছপালা, উপরে-পাশে টিন-দিয়ে-ঘেরা ঘর, নদী-খালে নৌকায় ভরা গুচ্ছ-গুচ্ছ বসবাস, জলাশয়— জলসিক্ত পরিবেশ মনকে প্রশান্ত করে, মনকে নাড়া দেয়। সুদূরীর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সুদূরীকে নিয়ে নৌকায় খালে-বিলে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে।

কামারখালি ঘাট পেরিয়ে কিছু দূর গেলেই মাগুরা। তারপর যশোরগামী রাস্তা, এঁকেবেঁকে মনের ঠিকানায় চলে গেছে। রাস্তার দু ধারের ছায়াঘেরা গাছ, দু পাশের বিস্তীর্ণ উঁচু সমতল ভূমি, ক্ষেত, ক্ষেতের মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ কেন জানি মনকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। সেই চিরচেনা অঞ্চল। স্মৃতিবিজড়িত মনের আয়নায় জীবন্ত ছবি। আমাদের অঞ্চল।

আমি সমতলভূমিতে বেড়ে ওঠা এ দেশের দুরন্ত সন্তান। দু-একবার মাঝপথে বাস থেকে নেমে রাস্তার ধারে গাছতলায় অনেকক্ষণ বসে থেকে, আবার কিছুক্ষণ হেঁটে চারপাশের চেনা ছবি মন ভরে দেখে দেখে, পায়চারী করে, আবার বাসে উঠে বাড়িতে গেছি। এ আমার মন জুড়ানো এলাকা, নিজেকে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে ফেলার এলাকা। কেন জানি, রাস্তার ধারে ঘাসের উপর বসে দূরে কোথাও তাকিয়ে প্রাণভরে দেখতে ইচ্ছে করে। সুদূরীকে খুঁজে পেতে ইচ্ছে করে। মনটা শান্তিতে ভরে যায়। 'শ্যামলা-মাটি মায়ের বুকে সইপাতি পরান, আমি এ দেশের সন্তান' — ভাবতে ভালো লাগে।

বাড়িতে পৌঁছুতে মাঝরাত হয়ে যাবে। এত রাতে গ্রামের রাস্তায় আমার চলা ঠিক হবে না ভেবে ছোট্ট সেই বাজারের পাশে সাহেদ মাস্টারের বাড়িতে ঐ রাতের মতো আশ্রয় নিলাম। সাহেদ মাস্টারের সাথে আমার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা, বয়সে আমার চেয়ে কমপক্ষে বারো বছরের বড়। রাতে খাওয়ার পরই বললেন, 'এবার আমি অভিভাবক-প্রতিনিধি হতে হাইস্কুলের ভোটে দাঁড়িয়েছি। আগামী পরশু ভোট। তুমি এসেছো দেখে খুব ভালো লাগছে। তোমাকে কিন্তু সারা দিন আমার সাথে থাকতে হবে।'

সকালে উঠে ভাবীর হাতে নাস্তা খেয়ে বাড়ির দিকে হেঁটে রওনা দিলাম। রাস্তার পাশে ফুটবল মাঠ, আশৈশব চেনা সেই স্কুল, করবী গাছ, আলাল দপ্তরির কুঁড়েঘর, ঘরের পাশে কুলগাছ— যেখানে আমি আমার মনকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছি। ধুলোভরা রাস্তা বেয়ে আজও বাড়িতে যাচ্ছি। স্কুল থেকে দল বেঁধে বাড়ি যেতে পথে রবারের দু-ফিতের স্যান্ডেলের পটাশ-পটাশ শব্দ এখনো কানে শুনতে পাচ্ছি। স্যান্ডেলে বেঁধে রাস্তার ধুলো পাজামার পেছনের পুরো

অংশটা একাকার করে দিত। সুদূরীদের পিছ ফেলে আগে যেতেই সুদূরী আঙুল উঁচিয়ে অন্যদের পাজামার ধুলো দেখাতো, আর হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা করতো। সে সুদূরী আজ রাস্তায় নেই, আমার মনের গভীরে স্মৃতির মিনারে আসন গেঁড়ে বসেছে। অনেক দিনের অনেক স্মৃতির পাতা উল্টাচ্ছি, আর হাঁটছি।

গাঙের ধারে এসে সুদূরীর পথের দিকে অজান্তেই তাকালাম। সারি সারি হিজল গাছের কোথা থেকে যেন সুদূরীর হাসি শুনতে পাচ্ছি। গাঙের উপর সেই এক-বাঁশের সাঁকো আর নেই। এলাকাবাসীর অনেক দিনের দাবি ছিল গাঙের উপর একটা ব্রিজ। গাঙের দু পাশ থেকে মাটি ভরাট করে রাস্তা বেঁধে এসে মাঝখানে সংকীর্ণ একটা কালভার্ট-সদৃশ ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। আধমরা গাঙ মৃতপ্রায় হয়ে গেছে।

ছোটবেলায় দেখেছি এই গাঙেই স্রোত ছিল। বর্ষা মৌসুমে স্রোতের প্রবলতা বাড়তো, কোনো কোনো বছর দু কূল প্লাবিত হয়ে যেত। কখনো হঠাৎ সাঁকো পর্যন্ত ভেসে যেত।

আবার মনে উঁকি দিচ্ছে সুদূরীর স্মৃতি, গাঙ পার হবার স্মৃতি। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমরা যতক্ষণ সাঁকো পার না হবো, সুদূরীরা ওপারে দাঁড়িয়ে থাকবে। বর্ষায় স্রোত বেড়ে যেত। কখনো-বা সাঁকোর উপর এক-বিঘত, এক-হাত পানি উঠে আসতো। আমাদের কেউ একজন পা-পিছলে সাঁকো থেকে পড়লেই ওরা হো-হো করে হেসে হাততালি দিত। আমি পড়ে গেলে অন্যরা হাসতো, সুদূরীর মুখের দিকে তাকাতো, সুদূরীর মুখটা ভার হয়ে যেত। এই সেই স্মৃতিজাগানিয়া, ব্যথাজাগানিয়া গাঙ।

গাঙ পেরোতেই বড় করে একটা সাইনবোর্ড রাস্তার পাশে টাঙানো। খালকাটা কর্মসূচি চলছে। কত হাজার টন গম এ প্রজেক্টের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, কাজের অগ্রগতিসহ বিস্তারিত হিসাব এতে লেখা। গাঙের তলদেশ গভীর করে খুঁড়ে জলাধার তৈরি করার প্রজেক্ট। এতে বর্ষার মৌসুমে গাঙে পানি ভরে থাকলে, শুষ্ক মৌসুমে তা সেচে ব্যবহার করে দু পাশের মাঠে ইরি ফসলের কাজ

করা যাবে। এতে চাষিদের মনে তৈরি হয়েছে বেশি বেশি ফসল ফলানোর অদম্য অপেক্ষা।

অতীতে এ গাঙের সাথে পদ্মার শাখানদীর সংযোগ ছিল। পদ্মার শাখানদী থেকে এ গাঙে পানি আসতো। বর্তমানে পদ্মা ও শাখানদীর অবস্থাও খারাপ। 'বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।' শুনেছি, পাশের বন্ধুরাষ্ট্র দীর্ঘ বছর ধরে গঙ্গানদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ দেয়ার চেষ্টা করে আসছিল। ফারাক্কা বাঁধের প্রতিবাদে মাওলানা ভাসানীর লং মার্চের আয়োজন আজো মনে পড়ে। বন্ধুরাষ্ট্র এতদিন বাঁধ দিতে পারেনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাঙালি যখন যুদ্ধে ব্যস্ত, সে সময় ভারত সরকার তলে তলে বাঁধ গড়ে ফেলেছে। স্বাভাবিক গতিপথ ভিন্নমুখী করা হয়েছে। উজানে বাঁধ দেয়াতে এ দেশের ভাটির নদী ক্রমশই শুকিয়ে গেছে। বন্যার সময় বাঁধ খুলে দিলে এ দেশ ভেসে যায়। আবার শুকনো মৌসুমে ধু-ধু প্রান্তরে বসে পরীক্ষিত বন্ধুর প্রতিদানে হা-হুতাশ করে। শুনেছি, এমন বহু নদীর উপর উজানে বাঁধ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। জিকে প্রজেক্ট মাঠে মারা গেছে।

পানি সংরক্ষণের জন্য বিকল্প পথ হিসেবে এই মরা গাঙ খনন করে জলাধার তৈরির প্রকল্প সরকার হাতে নিয়েছে। রাস্তার পাশে সাইনবোর্ড দেখে মনে হলো, বরাদ্দকৃত গম প্রায় শেষ। প্রকল্পও শেষ পর্যায়ে। গাঙের তলদেশের মাটি গাঙপাড়ে বেশি একটা উঠেছে বলে মনে হলো না। প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের মুখ স্বাধীনতার পরের রিলিফের গম, কম্বল ইত্যাদি মেরে খাওয়ার মুখ। এ মুখ অতি-চওড়া মুখ, এ মুখ ভরানো দুঃসাধ্য। তাছাড়া চামড়ার জিভ, যেদিকে খুশি উল্টাপাল্টা করে ঘোরানো যায়, কথা ঘোরে। প্রতিটা লোকই জানে, 'চাটার দল'-এর পরবর্তী উত্তর প্রস্তুত হয়ে আছে। বর্ষার আগ দিয়ে কাজটা শুরু করে, যাতে বর্ষার পরপরই বলতে পারে, 'খাল কেটেছিলাম, কিন্তু গত বর্ষায় সব আবার মাটিতে ভরে গেছে'। সোনার বাংলার সোনার মানুষের সোনার মাটি দিয়ে তৈরি রাজনৈতিক জিভ! এ জিভের তুলনা মেলা ভার।

রাস্তার পাশে গাছতলায় দাঁড়াতেই গ্রামের ভিতর থেকে একজন পরিচিত লোক কাছে এলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর এলাকার অবস্থা জানতে চাইলাম।

বললেন, 'গাঙ কাটা নিয়ে চেয়ারম্যানের নামে কেস হয়েছে। সরকার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি করেছে। এবার চেয়ারম্যানকে জেলে যেতেই হবে।'

বাড়িতে গিয়ে মাকে পেলাম। সারা দিন পাড়ার লোকজন, সহপাঠী ও মা-র সাথে কাটালাম। সন্ধ্যা নেমে আসতেই পাশের পাড়ার একটা বাড়িতে রাত কাটালাম। মা অনেক কথার মধ্যে একবার সংসার পাতার প্রসঙ্গ উঠালেন। আমি নিরুত্তর রইলাম। আমার মনে সুদূরীর সাথে ঘর বাঁধার বাসনা। তার অন্যের সাথে মন দেয়া-নেয়ার খবরে হৃদয়ের গভীরে দগদগে ক্ষত। আমি সুদূরীর কাছে জানতে চাই, সে এখনো আমাকে ভালোবাসে কিনা। অন্তত একবার তার মুখ থেকে শুনতে চাই। তারপর আমার সিদ্ধান্ত। অতো কিছু তো আর মাকে বলা যায় না। তাই চুপ থেকে সুদূরীর সাথে দেখা হওয়ার অপেক্ষা।

সকালে উঠে মা-র হাতে ভরপেট খেয়ে দশটা নাগাদ সাহেদ মাস্টারের ভোট করার জন্য স্কুলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। মা-র কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এ বিদায় রাতে সাহেদ মাস্টারের বাড়িতে থেকে পরদিন সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে বিদায়। মা গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, 'তোর শরীরটা খুব ভেঙে গেছে। একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া করিস। দুশ্চিন্তা করিসনে।'

সারা দিন সাহেদ মাস্টারের সাথে থেকে ভোট করলাম। আমার মন সুদূরীকে খোঁজার দিকে ব্যস্ত। স্কুলে সুদূরীর সেই ক্লাসরুম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রুম, করবীতলা, প্রতিটি বাঁকে বাঁকে সুদূরী যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি মরীচিকার মতো পিছ পিছ দৌড়াচ্ছি, তাকে খুঁজছি। কোথাও সুদূরী নেই।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা লাগে লাগে। ইতোমধ্যে ভোট গণনা শুরু হয়ে গেছে। আমি ও সাহেদ মাস্টার স্কুলের মাঠে বসে আছি। চেয়ারম্যান ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। অনেক আলাপ হলো। একবার তার গাঙ-প্রকল্প নিয়ে কেসে পড়ার কথা উঠালাম। উনি মনোকষ্টের কথাগুলো বললেন। বললেন, 'প্রকল্পটা করে বেশ ক লাখ টাকা লাভ হয়েছিল। মানুষের চোখে তা সহ্য হলো না। আমার নামে কেস হলো, তদন্ত কমিটি হলো, মাঝখান থেকে আমার পকেটের টাকাগুলো

তদন্ত কমিটির সদস্যদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিতে হলো। গাঙের মাটি তো সেখানেই পড়ে থাকলো। ইনশাল্লাহ তাড়াতাড়িই আমি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবো।'

এরপর আজ পর্যন্ত অনেকবার গ্রামে গেছি। গাঙের দিকে তাকাতেই দেখি, সে মাটি সেখানেই পড়ে আছে। শুষ্ক মৌসুমে পানির জোগান পেতে ইচ্ছুক অনেক চাষিই ধান ফলানোর অপেক্ষা ছেড়ে পরপারের পথ খুঁজে নিয়েছে। চেয়ারম্যান ভাইয়ের লাশও মাটিতে মিশে গেছে। চেয়ারম্যান বদল হচ্ছে বটে, গমও নতুন নতুন পকেটে যাচ্ছে, কখনো পকেট বদল হচ্ছে। গাঙের দু পাশ দখল হতে হতে গাঙের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। এ দেশে আর 'পুকুর চুরি' নেই, গাঙ চুরি, নদী চুরির উন্নয়নের স্রোত ত্বরিত গতিতে চলছে। এ দেশের অভিন্ন প্রায় সব নদীর উজানেই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ভারত সরকার বাঁধ দিয়ে ফেলেছে। ফারাক্কা বাঁধসহ আর কোনো বাঁধ নিয়েই কোনো কথা নেই। সময়ের গতিতে সবকিছুই চাপা পড়ে গেছে। তিস্তার উজানেও অনেক বছর থেকে পানি প্রত্যাহার চলছে। এখন শুধু তিস্তার বাঁধ নিয়ে বন্ধুর সাথে একটু-আধটু ভাব বিনিময় চলছে। কতদিনে বন্ধুর মন গলে কতটুকু পানি চুঁইয়ে তিস্তায় আসে, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা। এ পর্ব শেষ হলেই বন্ধুর সাথে উজানের বাঁধ-পানি প্রসঙ্গের যবনিকাপাত।

ছোটবেলায় দেখেছি, পাঁচ মাস শীত, বাকি সাত মাস অল্প-বেশি গরম। বইতে পড়েছি এ দেশের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কথা। এ সবকিছুই স্মৃতিকথা। শীতকাল ছোট হতে হতে এক-দেড় মাসে ঠেকেছে। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। অনেকের মতে, দেশটা মরুভূমির দিকে চলে যাচ্ছে। আমার জীবনেই 'এ-দেশ মরুভূমির দেশ' কথাগুলো বইতে পড়ে মরতে পারবো বলে অপেক্ষায় আছি! স্লোগান চলছে, বেশি করে গাছ লাগাও, গাছ লাগাও। আমি তো দেখি, আগে ছিল গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু বড় গাছ, আর বনবাদাড়। মানুষ এখন সচেতন। গ্রামের মানুষ এখন পরিকল্পিতভাবে গাছ লাগাচ্ছে— গাছের প্রতিপালন করছে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটলে চারদিকে পরিকল্পিত বাগান। তবু মরুভূমির খরতাপ। কেউ বলে না, 'নদী-নালা থেকে

পানি উধাও, পানির স্তর ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। পানি দরকার, জলাধার বাড়াও।' বন্ধুর অপকর্ম আড়াল করার, দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে নেয়ার এ এক অদম্য চেষ্টা।

সন্ধ্যার পর সাহেদ মাস্টার ও আমি ভোট গণনার কাছে গেলাম। দু জনে সেখানে কিছুক্ষণ বসলাম। সাহেদ মাস্টার বললেন, 'সজীব, এদিকে এসো, চলো, বাইরে কোথাও যাওয়া যাক।' তাঁর পিছ পিছ বাইরে এলাম। সাহেদ মাস্টার বরাবরই খুব রসিক মানুষ। বড্ড রগড় করে কথা বলতে জানেন। আমাকে বললেন, 'ভোটের ফল খুব ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে না। ভোটে হেরে গেলে তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে যাবে। রাতের খাবার খেতেও আর ভালো লাগবে না। চলো, তোমার ভাবী মুরগির মাংস রান্না করেছে। মনটা ভালো থাকতে থাকতে আগে আগে দুজনে মজা করে পেট পুরে খেয়ে নিই।'

এই সাহেদ মাস্টারকে নিয়েও জীবনে অনেক স্মৃতি। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের সময় তিনি আমাকে টিকিয়ে রাখতে অনেক সহযোগিতা করেছেন, সাহস জুগিয়েছেন, সুপরামর্শ দিয়েছেন। বর্তমানে অল্প আয়-রোজগারে অতি কষ্টে সংসার চলে। যখনই এলাকায় যাই, তাঁর সাথে দেখা করি, তাঁর বাড়িতে যাই। অনেক গল্প করি, সময় কাটাই। সময় করে কখনো দুজনে বিকেলে মাঠে চলে যাই। খুব আমুদে মানুষ। মাঠে ছোলায় পাক-ধরা মৌসুম এলে জমি থেকে কিছু ছোলার গাছ তুলি। মাঠে বসে বিলের নাড়া পুড়িয়ে আধ-পাকা ছোলাগুলোকে পোড়াই। দুজনে বসে ভরসন্ধেয় ছোলাপোড়া খাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছোলাপোড়া খেতে গিয়ে কতবার যে ছাগলের নাদি মুখে পুরে চিবিয়েছি– বুঝতে পেরে শেষে থু থু করে ফেলেছি, আর হেসেছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সাহেদ মাস্টার হো হো করে হাসেন, আর রসিয়ে রসিয়ে গল্প করেন। কবে তাঁর বাড়িতে আসবো সে অপেক্ষায় থাকেন।

ভাবীর হাতের মুরগি রান্না ও ভাত খেয়ে দু জনে গল্প করছি। সকালেই ঢাকায় চলে আসবো। চেয়ারম্যানের গম চুরি ও গাঙ শুকিয়ে মরে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলো। উনি স্বভাবসুলভ সেই রসিকতা করে বললেন, শোনো সজীব, একটা গল্প বলি: তুমি তো জানো, আমাদের এলাকায় মাদ্রাসা ও হুজুরের সংখ্যা কম। এক গ্রামে

একজন গরিব লোক মারা গেছে। জানাজা পড়ানোর মতো তেমন কাউকে ওখানে পাওয়া যাচ্ছে না। নিকটাত্মীয়রা বাড়ির ভিতর থেকে কাফন পরিয়ে লাশ বের করে রাস্তার ধারে গোরস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষায় আছে, এই পথে কোনো পথচলতি হুজুর যায় কিনা। তাকে অনুরোধ করে জানাজাটা পড়িয়ে নেবে। এক লোক দোয়া-কালাম কিছু জানে না, শখ করে নতুন দাড়ি রেখেছে, ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কুঁড়ে বেঁধেছে মাঠে, যাচ্ছে ছোলা পাহারা দিতে। অপেক্ষমাণ লোকগুলো তাকে মোটামুটি জোর করেই জানাজা পড়ানোর জন্য সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সে জানাজা পড়াতে নারাজ। তবু অনুরোধে ঢেঁকি গেলা আর কী! অনন্যোপায় হয়ে তকবির বলে তাহরিমা বেঁধে মনে মনে কিছু একটা পড়ে সালাম ফেরালো। এবার মোনাজাত ধরলো—

> 'কোথাকার মরা কোথায় এসে ম'লি
> যাচ্ছিলাম ছোলা পাহারা দিতে দাড়ি দেখে ধরে নিয়ে এলি
> আমার ছোলাই যদি খায় শুয়োরে
> এই মরার পিণ্ডি দেব ঐ কুঁড়ের দুয়োরে।
> আমিন, ছুম্মা আমিন।'

কথাগুলো বলে আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। ভিলেনের মতো করে হাসলেন। বললেন— যদিও চেয়ারম্যান আমাদের দলের লোক বলে সবাই জানে, এখানে দল বড় না— তার চরিত্র কী, তা দেখার বিষয়। প্রয়োজনে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধ করেছি, দেশী-বিদেশী যে কোনো অপশক্তির বিরুদ্ধে আবারো যুদ্ধ করবো। কোনো রাজনৈতিক দলের অপকীর্তির ঘানি টানার জন্য এ দেশ স্বাধীন হয়নি। আমি কোনোদিন অস্ত্র চিনতাম না। স্বাধীনতা আমাকে অস্ত্র চিনিয়েছে। অস্ত্র জমা দিয়েছি, ট্রেনিং রয়ে গেছে। এ দেশে কাউকে বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে ও স্বাধীনতার সুর তুলে ডাকাতি করতে দেব না। এ দেশের মানুষ দীর্ঘ বছর স্বাধীনতার অপেক্ষায় ছিল। এখন দেশী-বিদেশী ছদ্মবেশী শোষকদের থেকে দেশকে মুক্ত করার অপেক্ষায় জেগে আছি।

নয়

দিন কাটাতে কাটাতে বেশ ক'টা বছর পার করে ফেলেছি। বাড়িতে তেমন যাওয়া হয় না। কালেভদ্রে যাই। এলাকা থেকে কেউ এলে বিভিন্ন খবর পাই। দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এলে সুদূরীর কথা জিজ্ঞেস করি। সবাইকে বলা যায় না। কেউ কিছু শোনা তথ্য দিতে পারে, কেউ পারে না। ঢাকা শহরে একটা অস্থায়ী চাকরি জোগাড় করে নিয়েছি, তা দিয়ে পেটের রসদ জোগাই। মনে একটা আশা, এলাকার অবস্থা ভালো হলেই এলাকায় ফিরে যাব। সুদূরীর সাথে একটা বোঝাপড়া করে তাকে ঘরে তুলবো। ব্যবসা করে ওকে নিয়ে জীবন কাটাবো।

কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগি। ভাবি, 'যা রটে, তা কিছু-না-কিছু তো বটে।' সুদূরী হয়তো আমাকে ভুলে অন্য কারো সাথে জড়িয়ে গেছে, এখন অন্য কারো স্বপ্নে বিভোর। ভাবছে, যে স্কুল ছেড়ে চলে গেছে, এলাকাতেও নেই, যোগাযোগেরও কোনো ব্যবস্থা নেই, তাকে মনে রেখে কী লাভ! নতুন পথের সন্ধান করাই ভালো। নয়তো সে-ও তো কোনোদিন যোগাযোগ করার একটু চেষ্টা করতে পারতো। আবার হাসিব ভাই তো আমাকে সুদূরীর লেখা চিঠিই দেখাতে চেয়েছিল। বাড়িও একই গ্রামে, কাছাকাছি। তাহলে সুদূরী কি এখন হাসিব ভাইকে বেছে নিয়েছে? কিন্তু জানে আলম? শাহীনের সেই আত্মীয়? জানে আলম সহজে তাকে ছাড়বে বলে মনে হয় না। তার সাথে ছলনা করে পার পাওয়া শক্ত। সে তো শুনেছি গণবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আবার মনে প্রশ্ন জাগে— আচ্ছা, তার কারণেই কি সুদূরীকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে? সুদূরী স্কুলে কী এমন করেছিল যে, তার অভিভাবক তাকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল? মনে নানান প্রশ্নের স্তূপ। কোথাও কোনো উত্তর নেই।

একদিকে এলাকায় আমার জীবন টিকিয়ে রাখার অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে সুদূরীর দীর্ঘ নীরবতা আমার ব্যর্থতার গ্লানিকে আরো ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। হাসিব ভাইয়ের তুলনায় আমার চেহারার কমতি আমাকে মানসিকভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে। ইতোমধ্যেই শরীরের প্রতি অনিয়ম-অত্যাচার শুরু করে দিয়েছি। নিরাশার জীবন্ত অঙ্কুর সবার অগোচরে আমার অন্তরকে অনির্বাণ শিখায় দগ্ধীভূত করে চলেছে।

মেঘে মেঘে অনেক বেলা বেড়েছে। সাতটা বছর সুদূরীর সাথে দেখা নেই, কথা নেই, কোনো যোগাযোগও নেই। অজান্তেই মনে জমেছে অনেক ভুল বোঝাবুঝি। নইলে এত দিনে আমি বাড়িতে বলে তাকে ঘরে তুলে নেয়ার প্রস্তাব পাঠাতে পারতাম। দেখা হওয়া ছাড়া এ প্রশ্নের কোনো সমাধান নেই। শুধু দেখা হওয়ার অপেক্ষা, অথবা কারো মাধ্যমে ওর মনোভাব জানার অপেক্ষা। সুদূরীকে শুধু একবার দেখতে ইচ্ছে করে। এত দিনে সুদূরী দেখতে কেমন হয়েছে, কত বড়ো হয়েছে, জানতে ইচ্ছে করে।

এলাকা থেকে এক বন্ধু আমার কাছে এসেছে। এখানে চাকরির ইন্টারভিউ আছে। কথায় কথায় বললো, সুদূরীর তো বিয়ে হয়ে গেছে। শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠলো। মনে অসহনীয় ব্যথা অনুভব করলাম। অনেক তথ্যই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে অত কিছু জানে না। জানে, এক মাস আগে বিয়ে হয়ে গেছে। সুদূরীদের বাড়ি থেকে পনেরো-ষোল মাইল দূরের এক গ্রামে। ছেলেটাকে ও চেনে না, নামও কখনো শোনেনি। ছেলেটা গ্রামের পাশের বাজারে ছোটখাটো একটা ব্যবসা করে বলে শুনেছে।

এ বিষয়ে আমার মনে অনেক জানার আগ্রহ, কিন্তু তার কাছে এর বেশি তথ্য নেই। মনটা ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইল। হৃদয়টা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বন্ধু চলে গেলে বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। বার বার মনে হতে লাগলো, আমার সুদূ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চিরদিনের মতো দূরে চলে গেল! সুদূকে এ জীবনের মতো হারালাম! আমার জীবনটা শূন্যতায় ভরে গেল!

অতীতের স্মৃতিগুলো রেকর্ড-প্লেয়ারের মতো অন্তর-প্লেয়ারে নিরন্তর বেজে চলেছে। এ ব্যথা সামাল দেয়া আমার জন্য খুব দুঃসহ হয়ে গেল। বার বার চোখে ভেসে আসে সুদূরীর কৈশোরক চঞ্চলতা, হাসিখুশিভরা মুখ, করবীতলায় আমার জন্য লজ্জাবনত অপেক্ষা। আমি তার দিকে তাকাতেই সে তার লজ্জাভরা দৃষ্টিটা নীচে নামিয়ে নিতো। ওড়নার এক প্রান্ত দু-হাতে ধরে দাঁত দিয়ে চেপে ধরতো।

অফিস থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়েছি। রুমের বাইরে কোথাও বেরোইনে। চোখে ঘুম নেই। ইচ্ছে হলে কিছু কিনে খাই, নইলে উপোস। সম্বল শুধু এতদিনে ক্যাসেটে ভরা পুরোনো দিনের কিছু বিরহের গান। ঘরে শুয়ে বার বার শুনছি জসীমউদ্‌দীনের ‘বেদের মেয়ে’ নাটকের মোড়লের হাতে বেদেনীকে ছেড়ে, বেদে সর্দারের নৌকা বেয়ে ফিরে চলে যেতে যেতে গাওয়া সেই মর্মভেদী, প্রকৃতি ও জীবনদর্শী গান:

‘যারে ছেড়ে এলাম অবহেলে রে,
সে কি আবার আসবে ফিরে!
দোতারা মোর বাজবে কি আর রে,
ও যার তার গিয়াছে ছিঁড়ে রে,
        সে কি আবার আসবে ফিরে!
পোষা পঙ্খি ছেড়ে দিয়ে শূন্য খাঁচা লয়ে,
ওরে আর কতকাল থাকবো রে আমি দেশান্তরী হয়ে,
সে ছিল মোর বুকের মনি রে,
এখন জ্বলে সাপের শিরে রে,
        সে কি আবার আসবে ফিরে !’

প্রকৃতির এ কী নিয়ম! থেমে নেই কেউ। যে যায়, চিরদিনের জন্যই যায়। কেউ করো অপেক্ষায় কখনো বসে থাকে না— চলে যায়, যার যার পথে। ফিরে আসা— সে তো নিয়মের লঙ্ঘন, তা হয় না কখনো। পিছে রেখে যায় হারানো দিনের

স্মৃতি, আর অন্তর্দাহ। অতীত স্মৃতিঘেরা ছবিগুলো মনের মুকুরে স্থির জলছবি হয়ে নিরন্তর ভাসে। অতীত ভুলগুলো ক্ষণে ক্ষণে নীরবে কুরে কুরে খায় হৃদয়কে, অনুশোচনার জীবন্ত দহনে।

এক মাসের মধ্যে গ্রামের বাড়িতে গেলাম। আমি যেন মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছি। এবার মৃত্যুভয় আর নেই। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জমেছে। আমার বেঁচে থাকা না-থাকার কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছিনে। তবু মায়ের অনুরোধে রাতে দূরে অন্য বাড়িতে থাকলাম। কী করবো, কোথায় যাব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে।

একদিন পর সুদূরীর যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে শুনেছি, তার পাশের শহরের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে বাড়ি থেকে বেরোলাম। পথের মাঝে পাকা রাস্তা থেকে দক্ষিণ দিকে কাঁচা রাস্তা মাঠের মধ্য দিয়ে বেয়ে দূরের গ্রামে ঢুকেছে। বাস থেকে আনমনে মাঝপথে নেমে পড়েছি। গ্রামের পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছি। এই পথ কোথায় গিয়ে উঠেছে তা কে জানে! তবে এই পথের কোনো এক গ্রামে সুদূরী হারিয়ে গেছে, তা আমি জানি। হয়তো এখান থেকে বেশ দূরে পথের পাশে এক বাড়িতে সুদূরী জীবনের মতো স্থান করে নিয়েছে। অচেনা পথে সুদূরীর স্থায়ী নতুন ঠিকানা।

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘাসের উপর বসলাম। এই পথ যেন কত চেনা! সমস্ত মায়া যেন এ পথকে জড়িয়ে আছে। এ পথটাকে যেন সমস্ত শক্তি দিয়েও পিছু ফেলে উঠে আসতে পারছিনে। গুনগুন করে মন থেকে মুখে আসছে নজরুলের সেই স্মৃতিজাগানিয়া গান, ‘তুমি যে গিয়াছো বকুল বিছানো পথে, নিয়ে গেছ হায় একটি কুসুম আমার কবরী হতে’।

নজরুলের অনেক গান সুদূরী গাইতো। আজ আমি বসে আছি তার বিদায়-পথের দিকে চেয়ে। কান্না আসছে না, শুধু চোখ দিয়ে অজান্তে পানি চুঁইয়ে পড়ছে। হতবাক হয়ে বসে আছি। যেন যুগ যুগ ধরে এখানে বসে আছি। সুদূরীর অপেক্ষায় আছি।

কবে এ পথ বেয়ে সুদূরী ফিরে আসবে, সে অপেক্ষায় যেন আছি। চোখে ঠিকানাহীন উদাসী চাউনি—

তুমি সুদূরিকা—
তাই শুধু নিরন্তর পথ চেয়ে থাকা,
এত দূরত্ব আজ আমাদের মাঝে
কাছে ডাকা তাই তো আর না-সাজে।
সুদূরের প্রিয়ে—
তুমি আছো তাই আমি আছি চেয়ে
যেন অনিমিখে যুগ যুগ ধরে,
দুটি তৃষাতুর হৃদয় অভিসারে।

শহরে না-গিয়ে অজান্তেই ফিরতি বাসে চড়েছি। নজরুলের বিরহের গান মনে বাজছে, 'ভুলিও স্মৃতি মম, নিশীথ স্বপন সম, আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ 'পরে।'

বাড়ি ফিরে এসেছি। আরো একদিন বাড়িতে থাকলাম। মনের অবস্থা খারাপ কেন মা জিজ্ঞেস করলেন। আমি প্রশ্ন এড়িয়ে গেলাম। কথায় কথায় মা সংসার করার কথা উঠালেন। সেটাও এড়িয়ে গেলাম।

ঢাকায় ফিরে এসেছি। অনেক দিন আবার বাড়িতে যাওয়া হয়নি। তা প্রায় দেড় বছর হতে চললো। এর মধ্যে মা সাহেদ মাস্টারকে খবর দিয়ে ঘরে পুত্রবধূ আনার কথা বলেছেন। অন্য আরো দু-তিনজনকে বলেছেন। তাঁরা আমাকে চিঠি লিখে অনেক বুঝ দিয়েছেন।

অন্য কারো হাতে আমার জীবন-ঘুড়ির নাটাই দেয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমি এখন জীবন আকাশে সুতাকাটা ঘুড়ির মতো স্বাধীনভাবে উড়তে চাই। মনে মনেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বাড়িতে যাচ্ছি। পথের একটা বড় দুর্ঘটনা আমাকে মানসিকভাবে বেশ দুর্বল করে দিল। এছাড়া স্বামীহারা মা সেই ছোটবেলা থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এতটা বছর পার করে দিচ্ছেন। মার মুখের দিকে তাকালে আমি সবকিছু করতে পারি। তাকে না বলার সাহস নেই।

কিছু আত্মীয়-স্বজন আমাকে অনেক করে বোঝালো। তারা আমার ঘর বেঁধে দিল। আমি কিছু না দেখে, না বুঝে, না শুনে ঘর মেনে নিলাম। আশায় বুক বাঁধলাম, ঘর করবো বলে মন স্থির করলাম। মেঠো গানের সুর অন্তরের অন্তস্থলে অনুরণিত হতে লাগলো—

> ‘সর্বহারা হইলাম তবু শেষ হইল না আশা,
> আবার আমি ঘর বান্ধিলাম— সে ছিল দুরাশা রে-এ-এ,
> সে ছিল দুরাশা।’

আমার এক বন্ধুর বাড়ি মানিকগঞ্জ এলাকায়। আমরা ‘মানিকগঞ্জের বড় মিয়া’ বলে ডাকি। ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে গেছে। রাস্তার ধারে এক চা-র দোকানে বসে কয়েকজন মিলে গল্প করছে, চা খাচ্ছে। তার গ্রামের এক ভদ্রলোক, নাম আজমত আলী দেওয়ান, এসে ঐ দোকানে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়ালেন। আমার বন্ধুটা বলেছে, ‘আরে, দেওয়ান সাব, এটা কী করছেন?’ দেওয়ান সাব পিছন ফিরে তাকালেন। আমার বন্ধুটাকে সালাম দিলেন। বললেন, “স্যার, একসময় আমার অনেক ছিল। তখন আমি মানুষকে অনেক দিয়েছি। এখন আমি দিতে পারিনে, তাই এখন আমি আর দেওয়ান সাব না— আমি এখন ‘নেওয়ান সাব’। এখন আমি শুধু নিই, সবার কাছ থেকেই নিই। নিতে আমার অনেক ভালো লাগে।”

কয়েক মাসের মধ্যে অনেক অজানাকে আমার জানা হলো, অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকলো। বাস্তবতায় দেখলাম, আমার মায়ের নতুন আত্মীয় গোষ্ঠী ধরেই ‘নেওয়ান সাব’। তারা তিনটা জিনিসই কেবল চেনে, তা হলো: এক. টাকা, দুই. অর্থসম্পদ, এবং তিন. নিজস্বার্থ। তাদের চাপা-বুদ্ধি, পরখেকো মনোভাব, নীচু মানসিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও অপরিসীম লোভের ঝড় আমার অগোছালো নতুন ঘরে এসে ছোবল মারলো। মন ভেঙে গেল। জীবনে সুখের আশা ছেড়ে দিলাম। আমি ক্রমশ ঘরছাড়া হতে লাগলাম। ঘর আমাকে আর বেঁধে রাখতে পারলো না। আমি হলাম ছন্নছাড়া, দেশ-দেশান্তরী। জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইলাম। কিন্তু যেখানে যাই, সেখানেই জীবন, সেখানেই মানুষ। মানুষ আছে মানবতা

নেই, এ আমার স্বভাববিরুদ্ধ– অসহনীয়। জীবনের অনিশ্চয়তা, দেশের আইনহীনতা, দলীয় সন্ত্রাস আমাকে করেছে ভবঘুরে, জন্ম নিয়েছে জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচার মানসিকতা। হৃদয়ে অনির্বাণ তুষের আগুন অনিবার জ্বলছে। এ আগুন থেকে মুক্তির অপেক্ষা। মনে মনে বলি,

‘বিধি রে,
তুই আমায় ছাড়া রঙ্গ করার মানুষ দেখলি না,
আমার বুকটা ভরে তৃষ্ণা দিলি
সেই তিয়াসা মিটাই এমন মানুষ দিলি না।
বিধি রে ... ।’

ঘর ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কিছুই করেছি। এ দেশেও করেছি– কখনো পেশার কারণে, কখনো-বা শখের বশে। ‘ফুলের বনে যার পাশে যাই তাকেই লাগে ভালো।’

ভিনদেশে যতই থাকি, চলি, বেড়াই– মন বাঁধা পড়ে থাকে স্মৃতির নিগড়ে। মন পড়ে থাকে সেলিম ভাইয়ের অকাল প্রস্থান, সালামত চাচা-চাচির পরিণতি, জেলাশহরের সেই কানাগলির ঘর, যশোরগামী ছায়াঘেরা সর্পিল পিচঢালা পথ, গাছ-গাছালিতে ভরা সেই সমতল মাঠে। সব কিছুর মধ্যেই আমার মা ও সুদূরীর ছবি ভেসে আসে। সুদূরীকে এখন আর আমার ঘরে খুঁজিনে, খুঁজি পথে পথে, পাহাড়ে প্রান্তরে, বরফের স্নিগ্ধ চূড়ায়।

ভিনদেশের প্রতিটা নিয়ম, তাদের চিন্তাধারা, ঘটনার সাথে মনের অজান্তেই নিজ দেশের সবকিছুর তুলনা করি। ভাবি, এরাও মানুষ, এদেরও একটা সিস্টেম আছে, চিন্তাধারা আছে, সমাজ আছে, আছে স্বাধীনতা। আমাদেরও আছে স্বাধীনতা, চিন্তা-চেতনা, দেশীয় সিস্টেম ও মানসিকতা। সব কিছুই তুলনীয়। আমরা এমন হলাম কেন? আমরা গরিব বলেই কি আমাদের মানসিকতা এত নীচু? নাকি, আমাদের মানসিকতা নীচু বলেই আমরা এত গরিব? কোনটা ঠিক, মনে মনে উত্তর খুঁজি। পরিবর্তনের অপেক্ষা করি। আমার এক আত্মীয়– ঢাকায় এসেছেন ইউ.কে. থেকে। নিজেই বললেন, তিনি সারা পথ এয়ারওয়েজের লাঞ্চে

দেয়া সুদৃশ্য চামচগুলো ব্যাগে ঢোকানোর ধান্ধায় ব্যস্ত, অথচ পাশে বসা এক বিদেশিনী, একটা পুরো বই পড়ে শেষ করে ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলেন। কেন এমনটি হলো?

ইন্টারনেটে নিজ দেশের পত্রিকা পড়ি। অন্য দেশের পত্রিকাও পড়ি। আমাকে তা আকৃষ্ট করে না। শুধু ঘটনাগুলো জানি মাত্র। নিজ দেশের পত্রিকার ঘটনাগুলো চোখে চোখে জীবন্ত ভাসে; পরিবেশ-পরিস্থিতি স্মৃতিপটে মিশে যায়। ঘটনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে কখনো হাসি, কখনো কাঁদি, কখনো মনে মনে বিদ্রোহ করি, কখনো করি ঘৃণা। মনকে নাড়া দেয়। বুঝিনে, মনে মনে প্রশ্ন আসে, এর নামই কি ভালোবাসা, দেশপ্রেম? যতবারই শুঁকি, হাতে-পায়ে-গায়ে ছেলেবেলায় মাখা এ মাটির সেই ভোঁটকা একটা গন্ধ লেগে আছে। কোনোমতেই গন্ধ সরাতে পারিনে। রাখাল বয়সে বিলের মরা শামুকের গন্ধ শরীরে যে কীভাবে জড়িয়ে গেল, আজীবন সাবান, শ্যাম্পু দিয়ে ঘষে ধুয়েও তা কোনোদিন কোনোভাবেই সরাতে পারলাম না।

কলেজ লাইব্রেরি থেকে নিয়ে একবার শেক্সপিয়ারের ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’ পড়েছিলাম। শেক্সপিয়ারের আরো কয়েকটা বই পড়েছি। ভেনিস শহরকে দেখার আমার খুব ইচ্ছে। সাগরের মধ্যে ঘরবাড়ি, শহর। রোম থেকে ভেনিসে গেলাম। পানির মধ্যে গড়ে ওঠা দালানকোঠা, অট্টালিকা এবং অচিন্ত্যনীয় শহর— ঢেউয়ের দোলায় যেন দুলছে প্রতিটি স্থাপনা। স্পিড বোট, লঞ্চ কিংবা ইঞ্জিনচালিত বোটে চলাচল। পানির উপর দিয়ে অপ্রশস্ত রাস্তা। কখনো-বা দুটো ছোট-বড় সেতুবন্ধ পথ। পাশে বারো থেকে পনেরো তলা বড় জাহাজ ঘাটে ভিড়ে আছে। সারা বিশ্বের পর্যটকদের ভিড়।

ঢেউয়ের প্রতিটি দোলায় দালানকোঠার সাথে সুদূরীর ছবি ভাসছে। যেদিকে তাকাই সুদূরীর শূন্যতা। সুদূরী আমার হাত ধরে বেড়াতে খুব পছন্দ করতো। সেই সুদূরী এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছে, কে জানে! জানিনে, এ বিয়েতে তার সম্মতি ছিল কিনা। সেই পাকা রাস্তা থেকে নেমে-যাওয়া গ্রামের পথ। পথের পাশে একটা গৃহস্থবাড়িতে সুদূরীর স্থায়ী ঠিকানার কল্পিত যে-ছবি মনের পটে এঁকেছিলাম, সেদিকে দৃষ্টি। ভেনিস শহর আমাকে অস্থির করে তুললো।

ভাবলাম, শেক্সপিয়ারের লেখা ‘রোমিও জুলিয়েট’ও তো পড়েছি। এত শ’ বছর পর তারা কেমন আছে, দেখতে যাওয়া দরকার। ভেনিস থেকে বেশ দূর। গেলাম ছিমছাম সেই ছোট্ট শহরে, জুলিয়েটের বাড়িতে।

এ যুগের অজস্র রোমিও-জুলিয়েটের ভিড় সেখানে। দেখলাম, রোমিও-জুলিয়েট ক্লাব। বিভিন্ন ছবিসহ রোমিও-জুলিয়েট সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা।

জুলিয়েটের বাড়ির দোতলার সেই খোলা বারান্দাটা নির্বাক হয়ে মন ভরে দেখলাম— যেখান দিয়ে রাতে রোমিও গোপনে জুলিয়েটের সাথে যোগাযোগ করতো। আমার পাশে শুধু বিশাল শূন্যতা।

পরে গেলাম রোমিও ও জুলিয়েটকে যে দুই ভিন্ন পাহাড়ের শীর্ষে তৈরি-করা দালানে আটকে রাখা হয়েছিল, তার একটা পাহাড়ে। দুই পাহাড়ের মাঝে অনেক ব্যবধান। দুই পাহাড় থেকে দুজন দুই পাহাড়কে দেখে, দালান দেখে, কিন্তু দুজনের দেখা নেই, কথা নেই— আছে মনের পটে আঁকা ছবি। পাহাড়ে উঠে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলাম অন্য পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। দালানের সিঁড়ি বেয়ে উপরেও উঠলাম, কিন্তু ঝাপসা হয়ে আসা চোখে অনেক লেখাই পড়িনি। দালানের এক প্রান্তে দেয়ালের এক কিনার ধরে দূরের অজানায় অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। ফিরে আসার সময় দালানের গায়ে যুক্ত নাম লিখিনি। লিখলাম, একটি জোড়া-ছুট নাম ‘সুদূরী’।

জীবনে আর হয়তো আমার জুলিয়েটের বাড়িতে যাওয়া হবে না, ঐ পাহাড়েও যাওয়া হবে না— যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। তবে ‘সুদূরী’ নামটা রোমিও-জুলিয়েট নামের মাঝে থেকে যাবে। রোমিও তার জীবদ্দশায় জুলিয়েটকে পায়নি, আমারো সেটাই সান্ত্বনা। সেই ছোট্ট শহরটিতেও আমার রাত কাটাতে ভালো লাগেনি। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লেই যেন অন্তরের দহন থেকে বেঁচে যাই। অস্থিরতার পোকা প্রতিনিয়ত আমার মগজে কামড়ায়।

চলে গেছি অন্য কোনো দেশে, অন্য কোথাও— বহুদূরে। অনেক অনেক দেশে— কত বেশে! যেখানেই যাই, রাতে চোখ মুদে এলেই স্বপ্ন দেখি। দেখি, একদল লোক অস্ত্র হাতে আমার পিছু ধাওয়া করছে, আমাকে মারতে চাচ্ছে, গুলি করছে।

আমি দৌড়াচ্ছি, আর পিছু তাকাচ্ছি। দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপিয়ে যাচ্ছি, জীবনটা বের হয়ে যাচ্ছে, তবু তারা আমাকে তাড়াচ্ছে, ধরার চেষ্টা করছে, আমি আবার দৌড়াচ্ছি– নিজেকে লুকাচ্ছি। সুদূরী কখনো আমাকে আশ্রয় দিচ্ছে, বুকে টেনে নিচ্ছে, কখনো-বা অস্ত্রধারীর ভয়ে বলছে, 'চলো, দূরে পালাই।' ভেবেছি, এমন কোথাও যাব, যেখানে গেলে আমার ঘরছাড়া করা, জীবন সংহারক, পিছু ধাওয়াকারী গোষ্ঠী থেকে চিরতরে পালিয়ে থাকতে পারবো। সুদূরীর স্মৃতি, মুখচ্ছবি আমি ভুলে থাকতে পারবো। সেটাই হবে আমার শান্তির গুলিস্তান। আমি এখন অতীত ভুলতে চাই। সুদূরীকে ভুলতে চাই। সুদূরী আমার ব্যথা, আমার অবসর সময়ের ভাবনা– স্বপ্নের সাথী। উড়ে উড়ে গ্রহান্তরে গিয়েও দেখেছি। সেখানেও অস্ত্র হাতে পিছু ধাওয়াকারী, সেখানেও সুদূরী– আমার সুদূরী। সেই অতি চেনা মুখ, ডাগর দুটো চোখের আলতো লজ্জাভরা চাহনি, সেই উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ।

এ স্বপ্ন ও ছবির দৃশ্যপট থেকে পালিয়ে বাঁচার জায়গা আমি পৃথিবীর কোথাও পাইনি। পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে সুদূরী ও আমি, পাহাড়ের চূড়ায় সুদূরীর মুখ ভাসে। পাহাড় থেকে বয়ে যাওয়া স্ফটিক জলের অবিরল স্রোতে– সুদূরী ও আমি নিরন্তর সাঁতরাচ্ছি। সুদূরী আমার পাশে-পাশে ছায়ার মতো সঙ্গী হয়ে আছে। আনমনে কথা বলি। কথা ছিল, দুজনে বৈরাগী হয়ে পথে পথে গান গেয়ে কাটিয়ে দেব। আমি তো আজ পথের সন্ধানে পথে নেমেছি। কিন্তু সেই সুদূরী কোন-সে পথের বাঁকে যেন হারিয়ে গেল! তাই তাকে পথে পথে খুঁজি, খুঁজে পাবার অপেক্ষায়।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি– সেই বালকবেলায় রেখে যাওয়া ধুলো-কাদাভরা পথ, স্মৃতির ঠিকানায়। এখানে এলেই আমি পথের চলায় সুদূরীর পায়ের শব্দ শুনি, চেনা গাছের আড়ালে খুঁজি, মনের অগোচরে খুঁজে ফিরি তাকে দিঘল গাঙের কূল বেয়ে। কিন্তু সে-গাঙ তো আজ শুকিয়ে গেছে– শুষে নিয়েছে দেশী-বিদেশী শোষক চক্র, ভরাট হয়ে গেছে তলদেশ, যা কি-না একদিন আরো খোঁড়ার কথা ছিল। সুদূরী, সে গাঙ ও তার স্রোত এখন টিকে আছে শুধু স্মৃতির গহিনে।

দশ

ঢাকায় আছি। মাস্টারির একটা কাজও জুটিয়ে নিয়েছি। ঢাকায় সম্মেলনে যোগ দিতে এসে সাহেদ মাস্টার আমার বাসায় দেখা করতে এসেছেন। অনেক দিন পর দেখা। অনেক কথা পেটে জমেছে। ভাত ছাড়া যায়, তো সাথ ছাড়া যায় না। সকালে সম্মেলন। রাতে খাবার খেয়ে বসে গল্প করছি। ভারী কথা বলতে বলতে হালকা কথায় চলে এসেছি। ভাবী কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলেই হালকা রসিকতা করে অনেক কথা বলে ছাড়েন। তাঁর বিয়ের সময় ঘটক এক ফর্সা মেয়েকে দেখিয়ে পরে ভূতো-কালো এক মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। তাঁর সাথে এই অপ্রত্যাশিত প্রতারণা তিনি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি অনেক দিন দারুণ মনোকষ্টে ভুগেছেন। ভাবীর অমায়িক ব্যবহার। বছর না যেতেই সাহেদ মাস্টারকে জয় করে ফেলেছেন ভাবী। এক কথার উত্তরে অন্য কথা বললেন, ‘তোমার ভাবী রঙে বেশ কমা, এ তো তুমি জানো। সবকিছু তো মনের ব্যাপার। আমি সচরাচর কী করি, তুমি জানো? সন্ধ্যার পর পরই ঘরের লাইট বন্ধ করে দিই। অন্ধকারে তো সবই সমান, মনের মিলই বড় মিল।’

তিনি যে মনে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন, বুঝতে পেরে খুবই ভালো লাগলো। তাছাড়া কৌশলটাও নেহায়েত মন্দ না, ভেবে মনে মনে হাসলাম। পরিস্থিতি উপযোগী ব্যবস্থা।

সহসাই পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, ‘আচ্ছা সজীব, তোমার কি আজো সুদূরীর কথা মনে পড়ে?’

আমি তাঁর এ প্রশ্নে বিস্মিত হলাম। বুঝলাম, উনি ঘটনাটা কোথাও শুনে থাকবেন। সরাসরি উত্তরে না গিয়ে আস্তে করে বললাম, ‘কেন, ও কেমন আছে? আপনি কোনো খোঁজ রাখেন নাকি?’

বললেন— না, তেমন খোঁজ রাখিনে। ওরা এখন শহরে চলে গেছে। ওর স্বামী বড় ব্যবসায়ী হয়েছে। রাজনীতিকে ব্যবসার কাজে লাগিয়ে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে। সীমান্ত রোডের ধারেই বড় বাড়ি করেছে। আমি সেদিন ও পথে

আসতেই সুদূরীর সাথে ওদের বাসার সামনে দেখা। ও আমাকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলো, আগ্রহ দেখালো। বাসায় ধরে নিয়ে গেল। ওর মেজো মেয়েটাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে কিছু কথা জিজ্ঞেস করলাম। তোমার কথা মনে পড়ে কিনা জিজ্ঞেস করতেই ও ওড়নায় মুখ ঢাকলো, অনেকক্ষণ কাঁদলো। বললো, 'ওসব কথা উঠিয়ে আর মনটাকে দুর্বল করে দেবেন না। এখন মনে রেখে আর কীই-বা লাভ! সবই তো অতীত হয়ে গেছে। আমি বড় সংসারী হয়েছি। ও কেমন আছে?' আমি তোমার ছন্নছাড়া জীবনের কথা বলেছি, দেশান্তরী হবার কথা বলেছি। দেখলাম, সেও তোমার অনেক খোঁজ রাখে। তবে পরের মুখে শোনা কথায় সব সময় সঠিক খবরটা থাকে না। এতে ভুল বোঝাবুঝি ও অবিশ্বাস বাড়ে। তোমাকে একবার ওদের বাসায় নিয়ে যাবো। দেখে এসো, ও কেমন আছে। তবে তুমি তাকে ফাঁকি দিয়েছো বলেই তার মনে বিশ্বাস। দেখলাম, তোমাকে নিয়ে অনেক অবিশ্বাস তার মনে দানা বেঁধে আছে।

আমি নীরবে মাথা নেড়ে যাবার সম্মতি জানালাম। তবু মনে বড্ড দ্বিধা ও ভয় কাজ করতে লাগলো। নিজের কাছে নিজে বুঝ নিলাম, তাহলে আমার সুদূরী আজ আমাকে অবিশ্বাস করতে শিখেছে।

দীর্ঘ বছর এলাকা ছাড়া। কখনো ঢাকায়, কখনো প্রবাসে। এলাকার যুবসমাজ, যাদের বয়স পয়ঁত্রিশের কম তাঁদের অনেকেই আমাকে কখনো দেখেনি। হয়তো লোকমুখে নাম শুনে থাকতে পারে। আমার কিন্তু এলাকার অনেকের কথাই জানতে ইচ্ছে করে। ঘনিষ্ঠ কাউকে পেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করি। সাহেদ মাস্টারকে এলাকার অনেকের কথাই জিজ্ঞেস করলাম। সে-সাথে ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই, লাঠি খেলোয়াড় আজগর ভাই, করিম নানার অবস্থাও শুনতে চাইলাম। জানতে চাইলাম ফটিক ভাই ও কাঙালি ভাইদের পুরো লুঙ্গি পরার অপেক্ষার কথা।

ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই নাকি স্বাধীনতার পরও পঁচিশ-ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। দারিদ্র্য তাঁদের চিরসাথী। দিনমজুর পেশাতেই জীবন কেটেছে। তাঁদের ছেলে-মেয়েদের জীবনেরও একই অবস্থা– কেউ-বা পারিবারিক দিনমজুর পেশা অব্যাহত রেখেছে, কেউ রিক্সাভ্যান চালক হয়েছে, কেউ-বা হয়েছে রাইস মিলের শ্রমিক। কাঙালি ভাইয়ের এক ছেলে মিলের শ্রমিক হয়ে কাজ করতে গিয়ে ডান পা হারিয়েছে, এখন পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়ায়।

স্বাধীনতার পরও করিম নানা বিশ বছর বেঁচে ছিলেন। হতাশার জীবন্ত অঙ্কুর তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে। জমিগুলো দিনে দিনে অন্যের হাতে চলে গেছে। শেষে, বেশ ক'টা বছর মাথায় হাত দিয়ে তাঁর কুঁড়েঘরের বারান্দায় একটা পাটি বিছিয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকতেন। অপেক্ষার প্রহর তাঁকে অবশেষে কবরে পৌঁছে দিয়েছে। লাঠি খেলোয়াড় আজগর ভাইও মারা গেছেন। তিনিও শেষ দিকে এসে খেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। রোগেশোকে দীর্ঘদিন ভুগে জীবনের খেলা সাঙ্গ করেছেন। আমাদের গ্রামের আক্কাছ বয়াতির কথা জিজ্ঞেস করলাম। আক্কাছ ভাই কয়েকজনকে সাথে নিয়ে দল বেঁধে গান গেয়ে বেড়াতেন। জারি গান তার নেশা। একা-একাই গানের কথা তৈরি করতেন। তাঁর সাথেও সব-দলে-ভেড়া আমার সম্পত্তিজনিত প্রতিপক্ষের রেষারেষি ছিল। তাঁর জমির ক্ষেত খাইয়ে দেয়ার কারণে শত্রুতা। সেলিম ভাইয়ের সাথে তাঁকেও রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এক বছর নিরুদ্দেশ ছিলেন। হঠাৎ একদিন গ্রামে এসে হাজির। রক্ষীবাহিনী তাকে মারতে মারতে আধমরা করে কোনো এক জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি ফিরেও আক্কাছ ভাই দীর্ঘদিন বিছানায় ছিলেন। শেষে গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তবু রগুড়ে নেশা কি আর সহজে থামে! গ্রামের চৌমুহনীতে বসে সাগরেদবর্গকে নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে কথা বলতেন। কখনো ধুয়োজারির সুর তুলতেন। শেষ বয়সে গাইতেন,

'গুরু গুরু বলে ডাকি গুরু রসের গোলা-আ-আ,
ওরে, এমন দোয়া দিলে গুরু তুমি কাঁধে দিলে ঝোলা।
আহা-আ-আ-আ।'

এদের প্রত্যেকেই ছিলেন নৈতিক যোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাড়ি বাড়ি রুটি সংগ্রহ করতেন। নিজেদের বাড়ি থেকেও যা জুটতো তাই দিতেন। রসদ জোগাতেন। এঁদের কেউই তাঁদের জীবদ্দশায় মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেটের কথা ভাবেননি, তাই তা সংগ্রহ করার চেষ্টাও করেননি। সংগ্রহ করেও নিজেরা কিংবা সন্তান-সন্ততিরা দিনমজুর পেশা, কৃষিকাজ, ভ্যানচালনার কাজে এ সার্টিফিকেট দেখিয়ে কোনো অগ্রাধিকার পেতেন কিনা, তা বোঝা ভার। তবে অনেকে যুদ্ধে নামমাত্রও অংশগ্রহণ করেননি অথচ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে সক্ষমতা দেখিয়েছেন। তালিকায় নাম ঢোকানো ও বাদ দেয়ার লুকোচুরির খেলা তো

অবিরাম চলছে। এ খেলা আগামী এক শ বছর ধরে চলতে থাকবে বলে অনেকেই আশাবাদী! আবার এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ঐ সময় যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন, অথচ সার্টিফিকেটটা ঠিকই যথাসময়ে সংগ্রহ করেছেন। পত্রপত্রিকায় পড়ি, অনেক ভুয়া সার্টিফিকেটধারী সরকারি চাকরিতে নিয়মিত প্রমোশন নিচ্ছেন। ভোল পাল্টে, অতি বড় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলে দেখানোর জন্য প্রতিটা বাক্যের আগে ও পরে উচ্চারণের জন্য কিছু শব্দ বেছে নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ পাকে-চক্রে পড়ে, দলগত কারণে পরিণামে ধরা খেয়ে পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছেন। এক্ষেত্রে কত হাজারে হাজার যে অধরা রয়ে যাচ্ছে, তার কোনো খোঁজখবর ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই কোনোদিনই রাখেননি। তাঁদের আমৃত্যু কাঁচি-মাথাল বহাল রয়ে গেছে। সুদীর্ঘ বছরে তাঁদের সুবিধাটা কোথায়? তাঁরা এবং তাঁদের বংশধররা আজীবন সুবিধাবঞ্চিতদের দলে রয়ে গেছেন। এ দেশে যে সুবিধা নিতে জানে, নিজে নেয়— পরবর্তী বংশধরদের জন্য সুবিধা নেয়ার পথ সুগম করে রেখে যায়। আজব তরিকায় চলা জনগোষ্ঠীর আজব সব চালাকি।

সকালে উঠেই সাহেদ মাস্টার সম্মেলনে চলে গেলেন। পথ পর্যন্ত তাঁর সাথে গিয়ে অনেকক্ষণ তাঁর পথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দিনগুলো হু হু বেগে সামনের দিকে চলে যাচ্ছে। ভাগবঞ্চিত সম্প্রদায় সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হতে হতে শেষে সবকিছুই নিয়তির খেলা বলে মনকে প্রবোধ দিতে শিখেছে। এ খেলা যে স্বাধীন রাজনীতির সুবিধাবাদী চরিত্রের খেলা, মুখরোচক 'স্বাধীনতা' শব্দটা নিয়ে মেকি খেলা— তা তাঁরা বুঝতে অসমর্থ। এ খেলায় ফটিক ভাই, কাঙালি ভাই যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করতে করতে চুল-দাড়ি পাকান। শেষে জানাজার অপেক্ষায় পথের ধারে কাফনে মোড়া অবস্থায় হুজুরের শেষ দোয়া পাবার অপেক্ষায় থাকেন।

পথ থেকে ফিরে এসে সুদূরীকে নিয়ে একাকী অনেক কথা ভাবলাম। এ দেশে সুদূরীর স্বামীর ব্যবসায়ী-রাজনীতির ধারা, পত্রিকায় পড়া ও টিভিতে শোনা রাজনীতিবিদদের মুখসর্ব্বস্ব বুলি, সুদূরীর ভাগ্য ও প্রেম-সমীকরণ মেলানোর চেষ্টা করলাম। মাথাটা গোলমেলে হয়ে গেল।

বুঝলাম, সুদূরী আমাকে এখনো ভালোবাসে। ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদকে স্বামী হিসেবে পেয়ে ভালোই আছে। সম্পদজনিত কারণে হয়তো কোথাও মনোব্যথা

তৈরি হয়েছে। আবার অঢেল টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি তাকে সংসারের মোহে টেনেছে। এটাও তো সত্য যে, অবৈধ সম্পদ যেখানেই জমা হয়, স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সেখানেই মতদ্বৈধ সৃষ্টি হয়। অধিক সম্পদ ভালোবাসাকে নষ্ট করে। লেনাদেনা কমবেশি হওয়াতে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যও সৃষ্টি হয়। এ অসন্তোষ হয়তো সুদূরীর মধ্যেও থাকতে পারে। তার স্বামীর ভাই-ভাতিজাদের সাথে নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পদ ভাগাভাগিজনিত কারণও সংসারে অশান্তি বয়ে আনতে পারে।

আবার ভাবছি, সুদূরী আমাকে তাহলে অবিশ্বাসী ভেবেছে! তার ভাবনায়, আমি হয়তো প্রতারক, মিথ্যাবাদী। তাকে ফাঁকি দিয়েছি– তাই অবিশ্বাসী। এই অবিশ্বাস তাকে সংসারে মনোযোগী হতে সাহায্য করেছে।

অনেক বছর কেটে গেল। গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয় না বললেই চলে। প্রায় মূলছিন্ন হতে চলেছি। গ্রামের খোলা জায়গায়, খোলা হাওয়ায় চলে বেড়ানো মা শহরে এসে বদ্ধঘরে থাকতে চান না। আমার কিছু আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় গ্রামে বাস করেন। কখনো অল্প দিনের জন্য ঢাকায় আসেন। আমি আমার বিষয়-সম্পত্তির অনেকটাই– কখনো বিনা টাকায়, কখনো নামমাত্র টাকায় ভাগ্যাহত মানুষদের দিয়ে দিয়েছি। উদ্দেশ্য, হরেক রকম সন্ত্রাসকবলিত দেশে সম্পত্তিজনিত শত্রুমুক্ত হওয়া। আমার বুঝ, দলবাজ সোশাল টাউটদের সম্পত্তি দখল করতে দেয়ার চাইতে ভাগ্যাহত মানুষকে দান করে দেয়া ভালো। জমিজমা কখনো সম্পদ, আবার কখনো-বা আপদ। এভাবে না দিলে প্রতিপক্ষ এতদিনে আমার অবর্তমানে সব দখল করতো, রক্ষা করতে গেলে আমাকে শেষ করে ছাড়তো। যে সম্পদ ও আইনহীনতা আমাকে ঘরছাড়া করেছে, এ মগের মুল্লুকে সে সম্পদ থাকার চেয়ে বা তা নিয়ে যুদ্ধ করার চেয়ে প্রাণে বাঁচা জরুরি। এ জনপদে 'বেঁচে থাকাই জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ– বেঁচে থাকাই জিন্দাবাদ'– এই নীতি সার করেছি।

আমার এ ঘরছাড়া, অবৈষয়িক মানসিকতা ও জীবনযাপন মা আমার ঠিক-ঠিকই বুঝেছিলেন। আমার উঠতি বয়সে মাঝেমধ্যে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে মা বলতেন, 'সজীব, তোর দিয়ে সংসার হবে না, একতারা হাতে নিয়ে বৈরাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়। সংসারজীবন তোর জন্য নয়।' শেষ বয়সে এসে হয়তো আমার পরিণতির কথা ভেবে আবেগাপ্লুত হয়ে হতাশার সুরে বলতেন, 'সজীব, তোর সেই

ছোটবেলায় তোর বাপকে হারিয়েছি। তোকে নিয়ে সংসার করবো বড় আশা ছিল। আমিও এখন জীবনের শেষ সীমায় চলে এসেছি। তোকে আমি কোথায় রেখে যাব? তোকে রেখে যাবার আমি তো কোনো জায়গা খুঁজে পাইনে। আমি যে আর মনকে প্রবোধ দিতে পারিনে, তুই কার কাছে থাকবি? কে তোকে দেখে রাখবে? তোর তো দুনিয়ায় কেউ নেই।' মা-র কথায় আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তাম। মা-র কষ্টটা আমি বরাবরই বুঝি। নির্বাক হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকি, জীবনের চাওয়া-পাওয়ার যোগ-বিয়োগ মিলাই। পথ চলি।

বেশ কয়েক বছর থেকে কেন জানি সুদূরীর বাস্তব খোঁজখবর নেয়ার উৎসুকতা অনেক বেড়ে গেছে। সুদূরীর নাম গোপন করে তার ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদ স্বামীর খোঁজ বিভিন্ন জনের মাধ্যমে নিতে শুরু করেছি।

সুদূরীর স্বামী গ্রামের পাশের বাজারের ব্যবসা ছেড়ে শহরে ব্যবসা করতে এসেছিল। লেখাপড়া আইএ পর্যন্তই শেষ। আইএ পড়ার সময় সে কোনো এক দলীয় রাজনীতির আনুগত্য দেখাতো। পরে একবার নকলের সুযোগ নিতে বিএ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। পাস-ফেল কেউ জানে না। গ্রামের ব্যবসার স্বল্প-পুঁজি, সাথে রাজনৈতিক আনুগত্যের বৃহৎ পুঁজি একসাথে করে শহরের ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। এ দেশে রাজনৈতিক পুঁজির ব্যবসা শ্রেষ্ঠ ব্যবসা। সাথে যদি লাঠিয়াল বাহিনী এবং মুখের জোর বেশি থাকে বিনিয়োজিত পুঁজিতে বাৎসরিক রিটার্ন কয়েক গুণ। সাত-পুরুষ বসে খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুদূরীর স্বামীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। প্রায় বিশ বছর শহরের এ-যুগোপযোগী ব্যবসা। রাজনীতির সংযোগ ক্রমশই বেড়েছে। ব্যবসায় ভালো পসার জমেছে। ঐ শহরের বড় বড় কাজের পারমিট পায়, মাল সাপ্লাই দেয়, জেলা শহরে শিল্প কারখানা গড়েছে। কন্ট্রাকটরির লাইসেন্স আছে। বড় বড় কনস্ট্রাকশনের কাজ করে। স্থানীয় নেতাদের সাথে বসে টেন্ডার ভাগাভাগি করে। টেন্ডার বেচা-কেনা করে। কখনো নিজেই কাজ হাতে নেয়। বড় রাজনীতিবিদদের দলীয় ও ব্যক্তিগত টাকার গোপন জোগান দেয়। রাজনীতিকে ব্যবসার কাজে ব্যবহার করতে শিখেছে। সাথে ট্রান্সপোর্টের বড় ব্যবসা। সোনায় সোহাগা। এক অনন্য রমরমা ব্যবসা। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে দহরম-মহরম। কেন্দ্রীয় নেতাদের পিছ পিছ ঘোরা। প্রতি সপ্তাহে জেলা শহর থেকে রাজধানী শহরে দলবল নিয়ে আসা-

যাওয়া। বেশ বৈষয়িক করিতকর্মা ব্যবসায়ী-রাজনীতিক। দলে প্রসার। সুবিধাবাদী জনগণকে(?) সাথে নিয়ে ব্যবসা ও রাজনীতি সমানতালে করতে জানে। ঘরে ভাগ্যবতী স্ত্রী। ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতি, সোনার সংসার। পরকালকেও ভুলে যায়নি, সাথে রেখেছে। ইতোমধ্যেই তিনবার হজপর্ব সহি সালামতে সম্পন্ন করেছে। রাজনৈতিক ব্যবসা চলছে, আর পাপ-তাপ নিবারণে ঘন-ঘন হজব্রত পালন পরকালের নাজাতের মনস্তাত্ত্বিক শান্তি সুনিশ্চিত করছে। প্রতিটা কথার শেষে জনসমক্ষে ইনশাল্লাহ্ বলতে শিখেছে।

এ ধরনের ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে, শুনে বড় ভালো লাগে। আগে শুনতাম সরকারি উন্নয়ন বাজেটের টাকা বিশ-ত্রিশ ভাগ পকেটজাত হয়, সিস্টেম লসে যায়। বাকি সত্তর-আশি ভাগ টাকার কাজ হয়। এখন পত্রিকায় পড়ি ও বাস্তবে দেখি, ভাগাভাগিটা বাড়তে বাড়তে সিস্টেম লস, পকেটের পরিধি ও কাজের অনুপাত উল্টে গেছে। সবকিছুই ওপেন সিক্রেট। পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখি, অনেক স্থাপনার উদ্বোধনীর আগেই ফাটল ধরেছে। এছাড়া বাঁশের নানামুখী ব্যবহারে আছে উদ্ভাবনী ক্ষমতার স্বাক্ষর। আশাজাগানিয়া উন্নয়ন। রডের পরিবর্তে বাঁশের ব্যবহার। ব্যবসার সাথে রাজনীতির সম্মিলন ঘটিয়ে যারপরনাই ব্যক্তির উন্নয়ন, পুরো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন, ক্ষমতার উন্নয়ন। নিন্দুকের কুকথা, দুর্মুখ সাংবাদিক, পত্রিকার সাময়িক দু-লাইন বেরসিক কথা দু দিনেই বাতাসে ভেসে চলে যায়। ব্যবসা ও রাজনীতির মানিকজোড় সম্পর্ক সব নিন্দাকেই বিলীন করে দেয়। সবই গুরুর আশীর্বাদ।

আমিও সুদূরীর সুখ-কপালী ভাগ্যের কথা ভেবে মনে মনে শান্তি খুঁজি। জেলা শহরে বড় জমির উপর মূল রাস্তার পাশে সুদূরীর পাঁচতলা বাড়ি হয়েছে। ঘরের মেঝেতে চোখ পড়তেই নাকি আয়নার মতো মুখচ্ছবি দেখা যায়। বাড়িতে অসংখ্য চাকরবাকর, দুটো ড্রাইভার, দুটো দারোয়ান। বাসার আলমারি দামী কাপড়চোপড়, সোনাদানায় ভরা। তার মধ্যে আমার সুদূরী, ওরফে সুদূ, বিশাল সংসার পেতেছে। ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতি নিয়ে বিছানো সোনার সংসার।

মেঝের মার্বেল পাথরের দিকে তাকিয়ে মনের অজান্তে ক্ষুদ্র বেতনভোগী সজীবের মলিন মুখচ্ছবি স্মৃতির আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে অনাবিল সুখে কখনো ছন্দপতন

ঘটায় কিনা, তা কে জানে! তবে সুদূরীদের গ্রামের সেই হাসিব ভাই আমাকে যতই সুদূরী থেকে দূরে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুক না কেন, সে নিজেও তার জীবনে সুদূরীকে পায়নি। জানে আলম গণবাহিনীতে ঢুকে জান হারিয়েছে, সেও সুদূরীকে পায়নি। সুদূরী আজ সন্তান-সন্ততি নিয়ে স্বামী সোহাগিনী, ধনসম্পদ কপালিনী, সুদূরের আরো সম্পদ পিয়াসিনী।

হাসিব ভাই, সুদূরী আমার না– তার, এটা বুঝিয়ে কথা শেষে, রোমান্টিকতার আতিশয্যে গুন গুন করে আমাকে একটা গানও শুনিয়েছিল। গানটা আজও আমার মনে পড়ে: 'তুমি, তুমি বড় ভাগ্যবতী। আজ আমার ঘরে আঁধার, জ্বলে তোমার ঘরে বাতি। ...হলো তোমার ঘরে দিবস, আজ আমার ঘরে রাতি। না-না তুমি, তুমি বড় ভাগ্যবতী ... ।'

আজ সুদূরিকার ঘর সরকারের উন্নয়ন বাজেটের একটা বিরাট অংশ, খেটে-খাওয়া মানুষের কষ্টার্জিত অর্থের অনেকাংশ কৌশলে পকেটজাত হয়ে ঝাড়বাতির আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে। এ ঘরে এসে সুদূরিকা স্বামীর টাকা তৈরির ম্যাকানিজমে আত্মস্থ হতে পেরে বড়ই ভাগ্যবতী। দেশীয় রাজনীতির বরপুত্র পেয়ে সুদূরিকার স্বামী সত্যিই এ দেশের ভাগ্যবানদের একজন– দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ, সমাজহিতৈষী, মসজিদ কমিটির সভাপতি, আরো কত কী! আর স্বাধীনতার পর যুগ যুগ ধরে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ-শান্তিময় জীবনের জন্য অপেক্ষা করে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রামে হেরে হাসিব ভাই শেষমেশ বলতে বাধ্য হয়েছে, 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছো মহান।' অবশেষে হতভাগ্য হাসিব ভাই কবরে শুয়ে ক্ষুধার জ্বালা মিটিয়েছে। তার কবরে সত্যিই আঁধার নেমেছে। তার ঘরে আজ কবরের নীরবতা।

আমি সুদূরীর স্বামীর তৈরি অট্টালিকা কখনো দেখিনি। মনে মনে বিলাসে ভরা একটা পাঁচতলা অট্টালিকার কল্পিত ছবি নিজের মনে এঁকেছি। মনের কল্পনায়, সে অট্টালিকায় সুদূরীর শোবার ঘর, বারান্দা ও রান্নাঘরের একটা ঝাপসা ছবি মনের আয়নায় বসিয়েছি। একটু আনমনা হলেই সে কল্পিত ছবি হৃদয়ে ভাসে। দেখি, কখনো সুদূরী রান্নাঘরে ব্যস্ত, কখনো নাতি-নাতনিদের নিয়ে হাস্যরত, কখনো গুণধর স্বামীর হাসিমুখে বাসায় ফেরার খুশিতে অপেক্ষারত। কখনো নিজ

বিছানায় ক্লান্ত মনে স্মৃতির জানালায় নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। বুঝি, এ কল্পিত ছবি নিয়ে আমাকেও হাসিব ভাইয়ের মতো কবরে যেতে হবে।

কখনো সুদূরীকে একপলক দেখার জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে পড়ি। একবার কথা বলতে ইচ্ছে করে। ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। যৌবনের প্রারম্ভে দেখা সেই চঞ্চলা সুদূরী এখন দেখতে কেমন হয়েছে, দেখার অপেক্ষায় থাকি। ভাবি, সাহেদ মাস্টার না আমাকে সুদূরীর সাথে দেখা করাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন! সে সাহেদ মাস্টারও তো পরপারের টানে জীবনডিঙি সেই কবে ভাসিয়ে দিয়েছেন। আমি ওকে অন্তত একবার দেখতে চাই। মাত্র একটা প্রশ্ন করতে চাই। হাসিব ভাইয়ের কথা, জানে আলমের কথা, শাহীনের এক আত্মীয়ের সুদূরীকে দেয়া ফুলের কথা– এসব কোনো কথার প্রশ্নই ওঠে না। এ প্রশ্নগুলো ওর আত্মদহন ও আত্মজিজ্ঞাসার উপর ছেড়ে দিয়েছি। সে নিজেই মনে মনে ভেবে দেখবে, এগুলো তার চলার পথে ক্ষণিক ভুল ছিল কিনা, যার জন্যই সে হয়তো আমাকে হারিয়েছে। এ বিষয় সম্পর্কে তার অন্তরই সঠিক তথ্যটা জানে, যা হয়তো কোনোদিনই সে প্রকাশ করবে না। তর্ক করতে গিয়ে হয়তো অনেক যৌক্তিক কথা তুলে ধরবে। যৌক্তিকতা ও আত্মজিজ্ঞাসা আলাদা বিষয়। বিবেক-বিবেচনা বোধের অভাবে অনেকেই তর্ক করে জিততে চায়। আমি এ প্রশ্নে কখনোই যাব না, তর্কেও না। কখনো ভাবি, রাজনৈতিক লুটেরা শ্রেণীর একজনের সাথে এতটা বছর স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর-সংসার করার পরও কি তার আর আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মদংশন বলতে কিছু আছে? হ্যাঁ, এসব জিজ্ঞাসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, ওকে একবার দেখতে চাই। একবার দেখার অপেক্ষা।

এগারো

বাড়ি থেকে বাসে ঢাকায় ফিরছি। মনটা ভালো না। সুদূরীকে পিছ ফেলে ঢাকায় যাচ্ছি। এবার মা-বাবার কবর জেয়ারত করতে গিয়ে মনটা বেশি খারাপ হয়ে গেছে। কেন জানি মনে হচ্ছিল, বলি— তোমরা আরেকটু অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের পাশে তাড়াতাড়ি আসছি। আমারো সময় সমাগত।

বাসের জানালা দিয়ে চারদিক দেখছি। সেই চেনা পথ, সমতল মায়াঘেরা মাঠ, গাছগাছালি, জনজীবনের বাস্তবতা— দেখতে দেখতে আসছি। এক সময় বাস এসে দৌলতদিয়া ঘাট পার হবার জন্য ফেরি ধরার লাইনে দাঁড়ালো। দীর্ঘ-লম্বা লাইন। ফেরি পেতে অন্তত তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এ লাইন নিত্য। কখনো একটু কম, কখনো-বা অনেক বেশি। পজিটিভিজম-স্বভাবী হলে মনের সান্ত্বনা এভাবে দেয়া যায় যে, ঘাটে এ অপেক্ষার পালা তিন ঘণ্টা না হয়ে তো ছয় ঘণ্টাও হতে পারতো। ভাগ্যিস তিন ঘণ্টায় আজ পার হতে পারবো। সরকার বড় জনদরদি, নইলে ন ঘণ্টা কিংবা ছ ঘণ্টা বসিয়ে না রেখে মাত্র তিন ঘণ্টায় ফেরি পার। বড় করিতকর্মা জনপ্রতিনিধি, ভাগ্যবান জনসাধারণ!

ভাবছি, এ অলস সময়টা কীভাবে কাটানো যায়। ভাবলাম, এতটা সময় এ দেশের চলমান জীবন ও বাস্তব দশার পিণ্ডি দেয়া যায়। তিন ঘণ্টা অনেক সময়, অনেক পিণ্ডি দেয়া যাবে।

তিন ঘণ্টা অপেক্ষার কথা ভাবতেই মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। এমনিতে এ দেশের সব জায়গায় দীর্ঘ লাইন দেখলেই মেজাজটা রুক্ষ হয়ে যায়। পথে-ঘাটে ভোগান্তির শেষ নেই। ভোগান্তি দেখারও কেউ নেই, আছে জেগে ঘুমানোর লোক, সময় পার করার লোক। আশা দিয়ে সর্বস্ব লুট করার লোক। আর কতদিন এই ঘাটে অপেক্ষা! কেন এই অপেক্ষা? কেন এই শামুকের গতি?

বাড়ি থেকে এ পর্যন্ত বাসে আসতে এমনিতেই কোমরটা ব্যথা হয়ে গেছে। সারাটা পথ খানাখন্দে ভরা। রাস্তা তো নয়, যেন কুমিরের খাঁজকাটা পিঠ। পিচ ও পাথর উঠে-যাওয়া খাদে পড়ে বাসগুলো চলতে গিয়ে ধিতিন ধিতিন লাফায়। একবার

পিচ ঢাললেও, তা বেশিদিন টেকে না। এ দেশের রাস্তা-বিশেষজ্ঞরা টাকা খরচ করে বিদেশে দেখে এসেছেন, একবার পিচ ঢাললে ভালোভাবে চার-পাঁচ বছর যানবাহন চলাচল করতে পারে। সে নিয়ম এ দেশেও খাটায়। এ দেশে একবার পিচ ঢাললে কোনোরকম এক বছর জোড়াতালি দিয়ে চলে, বাকি তিন-চার বছর এই ধিতিন ধিতিন নাচন। কখনো খাদ-গর্ত এতো পরিমাণে হয়ে যায় যে, মোষের গাড়ি চলতে ভয় পায়, অথচ বাস-ট্রাক, অন্যান্য যান না চলে গত্যন্তর থাকে না। 'অদৃষ্টের লিখন, না যায় খণ্ডন।' 'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে' ভাবা ছাড়া আর উপায় কী? প্রতিটা মধ্যম মেয়াদি খরচ অব্যবস্থা-দুর্নীতির কবলে পড়ে পৌনঃপুনিক খরচে রূপ নিয়েছে।

আমি ঢাকায় যে বাসাতে বসবাস করি, সেই মহল্লার রাস্তার অবস্থাও একই দেখেছি। কয়েক বছর পর একবার পিচ ঢাললো। পিচের সাথে তিন নম্বর ইটের খোয়ার মিশ্রণ। এক মাসের মধ্যেই গাড়ির চাকার ঘর্ষণে উঠে চলে গেল। পিচ ও খোয়া গুঁড়ো হয়ে 'যাহা পূর্বং তাহাই পরং।' খানাখন্দে ভরা, পথে হাঁটা কঠিন। হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়। গ্রাম থেকে এলাম, সেখানকার রাস্তারও একই দশা। শহরের অধিকাংশ রাস্তা ও গলিপথের অবস্থাও তাই। চার-পাঁচ বছর চলার পরিকল্পনা করে যখন এক বছরেই কুমিরের পিঠ ধারণ করে, তখন কোথাও কোথাও বেশি গর্ত ভরাট করার জন্য রাস্তার উপর মলম মালিশ করতে দেখি। সেখানেও মেরামতের নামে বাজেট বরাদ্দ– ভাগ-বাটোয়ারার ফন্দি। শরীরের গভীর ক্ষতের অপারেশন করে ক্ষত ফেলে না দিয়ে, উপরে অবিরাম মলমের প্রলেপ দিতে থাকে। ক্ষতের উপরে কোনোভাবে একটা হালকা চামড়ার ভাব দেখাতে পারলেই বাজেটের টাকা পকেটস্থ করা শেষ। কোথাও কোথাও কাজ শেষ হওয়ার আগেই বিল উঠানো সারা। এবার দাও হাততালি। যার যার নির্দিষ্ট অংশ বণ্টন আগেই শেষ। চেটেপুটে হাঁড়ি চকচকে পরিষ্কার।

যুদ্ধের পরপরই যে লুটেরা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল, ওরা দিনে দিনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, সমাজে শিকড় গেড়েছে– আরো শক্তি সঞ্চয় করে সমন্বিত উদ্যোগে বলীয়ান হয়েছে। চার দশকেও এ নদীর উপর একটা ব্রিজ করা সম্ভব হয়নি, তাই ঘাটে বসে এ দুর্গতি, কমপক্ষে তিন ঘণ্টা করে অপেক্ষা। সবাই আশা দেয়– হবে। কবে হবে তা বলে না। সামনের দিনে হবে। কারো জীবদ্দশায় হবে

কিনা, সেটা তার ভাগ্যের ব্যাপার। একটাই উত্তর: অপেক্ষা করো। 'আর ক'টা দিন সবুর কর, রসুন বুনেছি।' তিন বছরের প্রজেক্ট সাত বছর, পাঁচ বছরের প্রজেক্ট দশ বছরেও শেষ হয় না। প্রজেক্ট উদ্বোধনীর নামে নাকের সামনে মুলো ঝুলাতে পারলেই হলো। তারপর সময় ক্ষেপণের পালা, ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ। বড় বড় প্যাঁচানো কথার ফুলঝুরি, জনদুর্ভোগ। সাধারণ মানুষের কপালে অপেক্ষার প্রহর।

আদায়কৃত ট্যাক্সের টাকায় সরকার চলে। বিভিন্ন রকমের ট্যাক্স। কত টাকা আদায় হয়— এটার হিসাবই শুধু খাতায় লেখা থাকে, বছর শেষে বাজেটের সাথে মিলায়। কত টাকার ট্যাক্স আদায় হতে পারতো, বাজেটেই এলো না— সে হিসাব লাপাত্তা। সে-টাকা বাজেট আয়ের বাইরে। ট্যাক্স ফাঁকির কারণে দেশ কত হাজার কোটি টাকার আয় বঞ্চিত হলো, এটা হিসাবের বাইরে। প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ ট্যাক্স আদায় হওয়া উচিত তা যদি আদায় হতো, ভালো পথে খরচ হতো, তাহলে এ রকম বিশটা নদীর উপর ব্রিজ আরো বিশ বছর আগে তৈরি হয়ে যেত। যত টাকা ট্যাক্স আদায় হবার কথা, প্রকৃতপক্ষে বাজেট হয় ও আদায় হয় তার দশ-ভাগের এক-ভাগ, বাকি সবটুকুই অদৃশ্য লস অব ইনকাম। এর হিসাব কেউ রাখে না। আদায়েরও চেষ্টা করে না, স্বপ্নেও ভাবে না। এ নিয়ে কোনো কথা নেই, কোনো ব্যবস্থাও নেই। গত বছরের তুলনায় আয় বাড়লো, না কমলো— এ নিয়েই শোরগোল। 'জিরো বেজড বাজেট'-এর ধারণায় ধুলো পড়ে পড়ে মরচে ধরে গেছে।

বিভিন্ন এক-ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কিংবা কোম্পানির পরিচালকরা গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, অট্টালিকা তৈরি করছে, বিদেশে প্লেজার ট্রিপে যাচ্ছে। ব্যবসার হিসাব দেখতে গেলেই খাতায় লেখা আছে, ব্যবসাতে লোকসান। এ দেশে যত ব্যক্তি বিভিন্ন কোম্পানিতে ছোট-বড়-মাঝারি পদে কাজ করছে, ট্যাক্সের টাকা আদায় করতে গেলেই দেখা যায়, খাতায় লেখা— বেতন খুব কম। তাই ট্যাক্সের পরিমাণও কম। প্রত্যেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দুটো করে খাতা— একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য, অন্যটা আয়কর অফিসে জমা দেয়ার জন্য। এ কথা সবাই জানে। প্রতিষ্ঠানের কর্তারা জানে, আয়কর বিভাগের কর্মচারী-কর্মকর্তা জানে, রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরাও জানে। এমনকি এ দেশের একটা আধা-পাগলা মানুষও

জানে। যুগ যুগ ধরে এটাই চলছে, এভাবেই চলছে। বাস্তবতা হচ্ছে, সঠিক হিসাব জমা দিতে গেলেই বরং ভোগান্তি। কোনো প্রতিকার নেই। সবাই অজানা কারণে মুখে কুলুপ এঁটেছে। হাত গেছে খোঁড়া হয়ে। মগজ হয়েছে অবশ। আত্মপ্রবঞ্চনা কাকে বলে! যাদের বলার ও দেয়ার অনেক কিছু আছে, তারা নীরব। সম্মান কিংবা জীবন নিয়ে টানাটানি। ভালোয় ভালোয় জীবনটা পার করার চেষ্টা। যাদের দেবার কিছুই নেই– 'নেওয়ান সাব', তারাই সামনের কাতারে, তারা সরব। চিৎকার করে কথা বলে, রাজনৈতিক মস্তান, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে 'মহাচরিত্রবান' নামের প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট অল্প সময়ের মধ্যে এনে দিতে পারে। তখন ফুলের মালা তারই গলায়।

বার বার মনে একটা প্রশ্ন জাগে, ডাস্টবিনে আবর্জনা জমে। তা থেকে নিশ্চিত দুর্গন্ধ বের হয়। আবর্জনা কি নিজে বোঝে যে, তার থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে? এ দেশে আবর্জনা নিজেই নিজেকে সুগন্ধি বলে জোর দাবি করে।

মালামাল দেদারসে আমদানি হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু কালো হাতের ছোঁয়ায় কোষাগারে আমদানি শুল্ক, ভ্যাট আদায় কম। জানতে ইচ্ছে করে, সুদূরীর স্বামীর কাছ থেকে আদায়কৃত ট্যাক্সের পরিমাণটা কত? এ দেশে ব্যবসায়ী রাজনীতিকদের বছরে মোট আয় কত? সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া ট্যাক্সের পরিমাণই-বা কত? এ দেশে তো এরা সবাই 'নেওয়ান সাব'। নেয়ার জন্যই তো মুখে মুখরোচক স্লোগানের চর্চা করেছে। এদের দু দিক থেকে আয়। সরকারি বাজেটের মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে আয়, আয়কর না দিয়ে ব্যয়সাশ্রয়– সেটাও আয়ের শামিল।

যত বিপদে আছেন আইনমান্যকারী করদাতারা। বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে, ধারার মারপ্যাঁচ দেখিয়ে, আইন মান্যকারীর ঘাড়ে অধিক করের বোঝা চাপিয়ে, যত বেশি কর আদায় করা যায়– তারই নিরন্তর প্রচেষ্টা। নীতিমালা একটাই, যারা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে চায়, তাদেরকে আরো ফাঁকি দিতে দাও, যারা ট্যাক্স দিতে আসে, বিভিন্ন কৌশলে বেশি বেশি ট্যাক্স আদায় করো। সরকার এটা বুঝতে চায় না যে, এক হাজার আইন মান্যকারী ব্যক্তি-করদাতার কাছ থেকে বিশ লাখ টাকা কর আদায় করা, আর একটা কোম্পানিকে পাঁচ কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে দেয়ার বন্দোবস্ত করা এক কথা নয়। আইন মান্যকারী করদাতা কর দিয়ে নিজের বৈধ

ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছেন। মাছের বাজারে গিয়ে সৎ করদাতা তাঁর থেকে কম বেতনভোগী কর্মকর্তার ট্যাক্স না দেয়া ঘুষের টাকা, কিংবা রাজনৈতিক চাঁদাবাজের অবৈধ টাকার সামনে দাঁড়াতে পারছেন না। মাছের বাজারে শুধু এদিক-ওদিক ঘুরছেন, আর ঠোঁট চাটছেন। যে মাছটা কেনার কথা ছিল তাঁর, কিনছে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক চাঁদাবাজ-মস্তান। এ সামাজিক অবিচারের কথা ঐ সৎ ব্যক্তিটি কোথায় গিয়ে জানাবেন? কে করবে এর বিচার? কোথায় সামাজিক ন্যায়বিচার? আমি জেগে আছি এই ন্যায়বিচার দেখার অপেক্ষায়।

যে কাজেই হোক, আইন মানতে গেছেন, তো মরেছেন। সব নিয়মকানুন ও ভোগান্তি আপনার কাঁধে।

আবার আদায়কৃত ট্যাক্সের টাকা বাজেটের মাধ্যমে ব্যবহার করতে গিয়েও লস। বাজেট শুধু আর্থিক পরিকল্পনাই নয়, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও বটে। এ দেশের বাজেট বাস্তবায়ন দেখলে তা মনে হয় না। উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত নগদ টাকা ব্যয়ের তুলনায় অর্জিত স্থায়ী সম্পদের মূল্য অত্যল্প। বাকিটা অদৃশ্য লস। দু জায়গায় লস। আয় করতে গিয়ে 'লস অব ইনকাম'; আবার ব্যয় করতে গিয়ে 'সিস্টেম লস', 'গাঁট-কাটায় লস'। 'মঘা, এড়াবি কয় ঘা'। ছ টাকা মাইনে পাই, ন টাকা ঘুষ দিই, আগা নায়ে গুন টানি' অবস্থা। আগা নায়ে গুন টানার মান্যটুকুই অবশিষ্ট।

সরকারি বাজেটে যে টাকা আসে, তার অনেকটাই চলে যায় জাতীয়করণকৃত সরকারি কর্পোরেশন, ব্যাংক, বীমা, সেবাদানকারী বিভাগের লোকসান বহন করতে। এটা এক বছর, দু বছরের লোকসান না। ভবিষ্যৎ ঠিকানা কতদূর– তাও অজানা। শুরু সেই স্বাধীনতার পর থেকে। প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসানের বোঝা। সাধারণ মানুষের টাকা একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও 'চাটা'-গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়ার জন্য জাতীয়করণকৃত এ সেক্টরগুলো তৈরি হয়েছে।

সব সেক্টরের মধ্যে ব্যাংকিং সেক্টরের কাহিনী আরো মধুর। জমিজমাসহ অঢেল সম্পদের মালিক ব্যাংকগুলো। বেসরকারি ব্যাংকগুলো যেখানে আমানতকারীদের টাকা খাটিয়ে লাভে ভরপুর, সরকারি ব্যাংকগুলো লোকসানি ব্যাংকের কাতারে।

তাও দু-একবার না— আজীবন। অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়, তলা ফুটো বলে থাকে না কিছুই। এ অবস্থার প্রধান কারণ ঋণ অনাদায় ও জালিয়াতি। আড়ালে আছে ব্যাংক কর্মকর্তাদের একটা অংশের সহযোগিতা, ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ এবং ঘটনার আড়ালে থেকে রাজনৈতিক মহলের কলকাঠি নাড়ানো ও ক্ষমতার মদদ। পুরোটাই রাজনীতির তেলেসমাত খেলা— ব্যাংকের টাকা নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের খেলা, রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের খেলা। নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় ব্যাংকেও ঘাপটি মেরে আছে অনিয়ম ও জালিয়াতির সহযোগীরা, রাজনৈতিক তল্পিবাহকরা। যেখানে যত অঘটনই ঘটুক না কেন, অল্প দিনেই চাপা দেয়া যায়, রাজনৈতিক বিবেচনায় পার পেয়ে যায়। সবই সাজানো নাটক— কিছুদিন মঞ্চস্থ হয়, তারপর নতুন ঘটনার আগমনে যবনিকাপাত। পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের সার্বিক অর্থ-আত্মসাতের প্রক্রিয়া ক্রমশই খারাপ দিকে যাচ্ছে। বেশ কয়েক বছর থেকেই রাজনীতিবিদদের ব্যাংক-ব্যবসার দিকে নজর পড়েছে। ব্যাংক খোলার সরকারি অনুমতি মিলছে। সাধারণ মানুষের আমানত সংগ্রহ করছে। ব্যবসায়ী-রাজনীতিকরা ব্যাংকের টাকা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে। দায়বদ্ধতা এড়ানোর অনেক পথ আবিষ্কার হয়ে গেছে। বর্তমানে অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংকের মালিকানায় ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদরা এসে গেছেন। অর্থ শুষে নেয়ার এটাও একটা অভিনব ফন্দি। দিন যত সামনে এগুচ্ছে, অর্থ হাতিয়ে নেয়ার ফন্দিরও নতুনত্ব ও অভিনবত্ব বাড়ছে। এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলেই মুখ বন্ধ করার কৌশল জানা আছে। নিতান্ত অনন্যোপায় হলে 'নিরুদ্দেশ থেরাপি'। ব্যাংকিং অর্থনীতির সাথে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের যৌগ মিলিয়ে ফেললে পরিস্থিতি যে কতটা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়, তার বাস্তব চিত্র আজকের বাংলাদেশ।

সেবা উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানির অবস্থা আরো নাজুক। সেখানেও রাজনৈতিক দলীয় ইউনিয়ন, সমিতি সদলবলে বিদ্যমান। মেরে খাওয়ার ধান্দায় বিভোর। আসল কথা হলো, ব্যাংকিং এবং নন-ব্যাংকিং এসব কোনো সেক্টরেই কখনো কোনো দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। রসাস্বাদন খেলা চলছে অবিরাম।

প্রতিষ্ঠানের আয়-উপার্জন দু ভাবে বৃদ্ধি করা যায়— উৎপাদনের উপাদানসমূহের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে অথবা বিক্রিমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে। সরকার একচেটিয়া কারবার করে বিধায় সিস্টেম লসের নামে যত লুটপাট, অব্যবস্থা, গলতি, অপচয়, দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা না করে বার বার বিক্রিমূল্য বাড়িয়ে লোকসান সমন্বয় করার একমাত্র সহজ চেষ্টা করে। এভাবে পুরো অনিয়মের বোঝা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে গিয়ে চাপে।

এভাবে এ দেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি সেক্টর নিয়ে রাজনৈতিক শোষণের মহাকাব্য লেখা যায়। এ দেশের রাজনীতির কালো হাতের ছোঁয়া ও কালো ছায়া যে বিভাগে ও সেক্টরেই পড়েছে, সেখানেই অনিয়ম, অব্যবস্থা, দুর্নীতি, অপচয়, লুটপাটের আখড়া জমে উঠেছে। 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র তলা আজো তলাবিহীন রয়ে গেছে। এ কালো ছায়ার বিস্তার ক্রমশই বাড়ছে। এ অপচ্ছায়া সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী। ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝা যায়, এ বিষয়ে চৈতন্যোদয় হতে এখনো অনেক বাকি। সে চৈতন্যোদয় দেখার অপেক্ষায়।

অবশ্য যুগ যুগ ধরে এই লোকসান দেয়া ও লুটপাট করার পক্ষেও যুক্তি দেখানোর মতো অনেক সুবক্তা এ দেশে তৈরি হয়ে গেছে। কেবল এ সেক্টরগুলোর সুশাসন সুনিশ্চিত করার মতো কোনো বিবেকবান ব্যক্তিত্ব এখনও তৈরি হয়নি। আমরা সেই বিবেকবান ব্যক্তির অপেক্ষায়।

পূর্ব ইউরোপের যে দেশগুলোতে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানকার একটা দেশে আমার অনেক দিন থাকতে হয়েছিল। সেখানেও মার্কসবাদ-লেলিনবাদ অকার্যকর হয়ে চিরদিনের মতো তখন নির্বাসিত। রাজধানী শহরের একটা বাসার সাত তলায় ছোট্ট একটা রুমে বাস করি। জানালা খুললেই পুব পাশে বিশাল এক খেলার মাঠ। চারপাশ গাছে ঘেরা। তার পাশ ঘিরে বড় বড় অট্টালিকা। পাশ দিয়ে পিচঢালা রাস্তা। এক কোণে একটা ডাস্টবিন বসানো। প্রতিদিন একটা গাড়ি আসে। একটা বিন গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়। আগের দিনে রেখে যাওয়া ময়লায় ভরা বিনটা গাড়িতে উঠিয়ে নেয়— চলে যায়। ঐ দিন বিনটা গাড়িতে উঠাতে গিয়ে একটা আধা-ছেঁড়া কাগজ বাতাসে উড়ে কিছুদূর চলে গেল। প্রবল ঠান্ডা বাতাস বয়ে চলেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রোদের দেখা নেই। যে

কোনো সময় তুষারপাত শুরু হয়ে যাবে। চালক ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে কাগজটা কুড়ানোর জন্য ছুটে গেলেন। বাতাস এসে কাগজের টুকরোটাকে আবার উড়িয়ে আরো দূরে নিয়ে গেল। লোকটা আবার পিছ পিছ ছুটলেন। মাঠের শেষ প্রান্তে গিয়ে কাগজটা হাতে ধরলেন। ময়লার বিনে এনে রাখলেন, গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। তার সাথে কোনো হেল্পারও নেই, তার কাজ পাহারা দেয়ার জন্য একাধিক সুপারভাইজার-কর্মকর্তাও নেই।

আমি সাত তলার জানালায় বসে আমাদের দেশের ডাস্টবিন কর্মচারী-কর্মকর্তা ও অন্যান্য অফিসে কর্মরত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের দায়িত্ববোধের সাথে সরকারি এ লোকটার দায়িত্ববোধ, মানসিকতা ও স্বভাবকে মিলালাম। ঐ স্বভাবের লোক এ দেশে কোথায়? যদি থেকেও থাকে, তাদের চিহ্নিতকরণ ও শুমারি হয়েছে কিনা? দেশের উন্নয়ন লুকিয়ে আছে ঐ লোকটার ঐ স্বভাবের মধ্যে। আমরা উন্নয়ন খুঁজছি আগেই ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে। চটকদার রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন ও মিথ্যাবাদিতার মধ্যে, রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতির মধ্যে, প্রতিপক্ষকে ঘরছাড়া করার মধ্যে, ক্রসফায়ারের নামে মানুষ হত্যার মধ্যে, গুমের মধ্যে।

সরকারি কাজে উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ও দেশ-পরিচালনাকারীদের চরিত্রের বদল না করে, মানসিকতার পরিবর্তন না এনে, ছোটবেলায় গল্পে পড়া সেই বাদরকে রুটি ভাগ করার পুরো দায়িত্বটা দিচ্ছি। রুটিটা টুকরো টুকরো হতে হতে এক সময় পুরোটাই বাদরের পেটে চলে যাচ্ছে। আজব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা— আজব চরিত্রের মানুষের ভিড় জমেছে রাজনীতির ছত্রছায়ায় দেশ ব্যবস্থাপনায়।

স্পষ্টবাদী নেতা শেখ মুজিবের জীবন-থেকে-নেয়া সেই মন্তব্যগুলো আজো বড্ড মনে পড়ে। তার একটা হলো, 'চাটার দল চেটেই সব শেষ করে ফেললো।'

দেশে যে মানব উন্নয়ন ধারা শুরু হয়েছে, তাতে নিশ্চিত বোঝা যায়, 'দিল্লি হনুর দূরস্থ'। উন্নয়নের নামে সুবিধাবাদী লোকগুলোকে দলে টেনে জনগোষ্ঠীর চরিত্র ও মানসিকতাকে ধ্বংস করে দিয়ে আমরা জাতীয় দুর্গতিকে বরণ করার জন্য গেট সাজাচ্ছি। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিয়ে ঘোড়ার মাথা দিয়ে গাড়িকে সামনে ঠেলে

নিয়ে যাবার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। গাড়িও সামনে যাচ্ছে— তবে, শামুকের গতিতে। উন্নয়ন মানে যে ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, আমরা তা বুঝতে অসমর্থ। কোথাও থেকে ঋণের নাম করে দেশ বিক্রি করছি। অবকাঠামো তৈরির নাম করে বরাদ্দের বেশির ভাগ অংশ দলীয় বিবেচনায় পকেটজাত করছি, বিভিন্ন পন্থায় মেরে-কেটে খাচ্ছি আর উন্নয়নের জিগির তুলছি।

আসলে উন্নয়ন মানে দেশে বসবাসকারী সার্বিক জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন, স্বভাবের উন্নয়ন, চিন্তাধারার উন্নয়ন, সুশিক্ষার উন্নয়ন, সিস্টেমের উন্নয়ন। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন তারপর আপনা-আপনি আসে। সেটাই হয় টেকসই উন্নয়ন। সে উন্নয়ন প্রচেষ্টা কোথায়? নইলে, সরকারি অট্টালিকা তৈরিতে রডের পরিবর্তে বাঁশের বিকল্প ব্যবহার আবিষ্কার হবেই। আবিষ্কারক সংশ্লিষ্ট বেরসিক সাংবাদিককে হয়তো কোনোভাবে ম্যানেজ করতে না পারাতে আবিষ্কারটা খবরের শিরোনাম হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এ আবিষ্কার অনেক পুরোনো আবিষ্কার, হঠাৎ আলোর মুখ দেখেছে। এ আবিষ্কার আছে বলেই তো উদ্বোধনীর আগেই বিল্ডিংয়ে ফাটল ধরে, পত্রিকায় বার বার একই খবর পড়তে হয়। ফাটলটা উদ্বোধনীর পর ধরলে তো আর খবর পড়া লাগে না। এ আবিষ্কার আছে বলেই তো কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে রাস্তায় পিচ-পাথর ঢাললেও অচিরেই তা কুমিরের পিঠ-আকার ধারণ করে। সুদূরিকার স্বামীর মতো লাখ লাখ রাজনীতিপ্রিয় স্বামীর হাতের পাঁচটা আঙুলই ফুলে একসাথে কলাগাছ হয়ে যায়।

বাজেট বরাদ্দ যত বেশি, লাভের মার্জিনও তত বেশি হয়, মধ্যস্বত্বভোগীর পকেট-উন্নয়নও তত বেশি হয়। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় তা প্রটেকশন পায়। এজন্যই তো সুবিধাবাদী লোকজন দলে দলে রাজনৈতিক দলে ভেড়ে। এ সহজ তত্ত্ব এ দেশের কে না বোঝে? এটা তো এ দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু অব্যাহত ধারা। আমি দেখেছি, এ দেশের আটানব্বই ভাগ লোকই স্বাধীনতার স্বপক্ষীয় শক্তি ছিল। নতুন প্রজন্মের আগমনে বর্তমানে সেটা বেড়ে নিরানব্বই ভাগে পৌঁছেছে। কেউ স্বপক্ষীয় শক্তি বলে জিগির পাড়ে, আবার কেউ নীরব থাকে— এটাই পার্থক্য। এ জিগির ক্ষমতা পাকাপোক্ত করা ও চেটে খাবার জিগির। এ জিগিরের বিজ্ঞাপন এ দেশীয় এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনকেও হার মানাচ্ছে। প্রতিটা ক্ষমতাসীন দল

'তলাবিহীন ঝুড়ি'র গায়ে রংচং পালিশের বিজ্ঞাপন প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। ঝুড়ির তলা ক্রমশই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই, ঝুড়ির তলা তৈরিতে কারো আগ্রহও নেই, কেউ মনোযোগীও নয়। সবাই রং পালিশের বিজ্ঞাপনে ব্যস্ত। আমি এ জিগিরের অনিবার্য পরিণতি দেখার অপেক্ষায়।

বাসে চড়ে যে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে এ ঘাটে এলাম, যেদিকে তাকাই ফসলের ক্ষেত, গাছগাছালিতে ভরা– চোখ জুড়ানো ছবি। এ মাটিতে বীজ ছড়াতে পারলেই সোনা ফলে– তাই সোনার বাংলা। চাষি উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সোনা ফলায়। শিল্পোদ্যক্তা নিজ উদ্যোগে শিল্পপণ্য তৈরি করে। তারা কোনো রাজনীতির সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। নিজ উদ্যোগে ফসল ফলায়, পণ্য বানায়। বিশ্ব আজ গ্লোবাল-ভিলেজে পরিণত হয়েছে। এক জায়গার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কিছু দিনের মধ্যেই সারা বিশ্বে সব জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সারা বিশ্ব উচ্চ-ফলনশীল বীজ সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। উৎপাদন আগের তুলনায় চার-পাঁচ গুণ হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে বীজ আসছে, কিছু কিছু এ দেশের কৃষিবিদরা অন্য দেশের বৃত্তি পেয়ে গবেষণা করে উদ্ভাবন করছেন। সোনার মাটিতে সে বীজ ছিটিয়ে সোনা ফলাচ্ছে। এটা তো কোনো নির্দিষ্ট সরকারের অবদান নয়, নতুন প্রযুক্তির বৈশ্বিক অবদান।

দেশের বিশাল জনশক্তির একটা অংশ ভিটেবাড়ি বিক্রি করে বিদেশে গিয়ে শ্রম দিচ্ছে। রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাপ-ভাইকে টাকা পাঠাচ্ছে, জমি কিনছে, ইটের ঘর তুলছে। এতে কোনো সরকারের অবদান কতটুকু? বরং পার্শ্ববর্তী ভারত ও চীনের জনগোষ্ঠী বিদেশে গিয়ে এ দেশের শ্রমিকদের তুলনায় উচ্চপদে কাজ করছে। আর এ দেশের জনগোষ্ঠী মালয়েশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গিয়ে কেউ-বা ঝাড়ুদার, কেউ-বা ড্রেন ক্লিনার, নির্মাণ শ্রমিক ইত্যাদি নিম্নপদে কাজ করছে, আর মানবেতর জীবনযাপন করছে। বরং প্রাত্যহিক ছবি হলো, টাউট রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় বিদেশগামী শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে। ভিটেবাড়ি বেচা টাকা হারাচ্ছে। আদম বেপারিদের একটা বড় অংশ প্রবাসী শ্রমিকদের পাসপোর্ট কৌশলে বিভিন্ন শর্তের

আড়ালে সে দেশে জমা রেখে শ্রমিকের কষ্টার্জিত অর্থে ভাগ বসাচ্ছে, শ্রমিককে ব্লাকমেইল করছে। আদম বেপারি কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের স্লোগান দিয়ে, বিনা বিচারে পার পেয়ে তথাকথিত উন্নয়নের জিগিরে শরিক হচ্ছে। এসব শোষণের শুমারি কোথায়? প্রতিবিধান কোথায়? ঐ ক্ষমতাহীন অসহায় শ্রমিক বিচার পাবার অপেক্ষায়।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ও মালয়েশিয়াতে দেখেছি, সেখানে অধিকাংশ বাঙালি অমর্যাদাকর অবস্থায় শ্রম বিক্রি করছে। এ দেশের রাজনৈতিক অব্যবস্থা-কুব্যবস্থা, শোষণ তাকে শ্রমিক বানিয়েছে।

এই শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে যদি যুগোপযোগী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে রাজনৈতিক শোষণমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যেত, তাহলে তারা বিদেশে গিয়ে অন্যের তুলনায় প্রখর মেধার স্বাক্ষর রাখতো, শ্রমিক নামে পরিচিতি লোপ পেতো। একটু উঁচু পদে কাজ করতো, বেশি টাকা রোজগার করতো। দেশ অনেক আগেই বিশ্ববাজারে অনেক উপরে স্থান করে নিত।

এ দেশে পণ্য ও সেবার বড্ড কদর। জনসংখ্যা বেশি— তাই পণ্যের চাহিদা বেশি। ব্যক্তি অন্য দেশ থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তি-উদ্যোগে শিল্প-কারখানা তৈরি করে, নিজের অক্লান্ত শ্রম ও প্রখর মেধা খাটিয়ে শিল্পে প্রসারতা আনে। চাহিদার কারণে বাজার পায়। এতে কোনো নির্দিষ্ট সরকারের অবদান কোথায়? অথচ সরকারি রাজনীতির ছত্রছায়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার কোটি টাকার অবৈধ চাঁদা দিয়ে ব্যক্তিভিত্তিক শিল্প-কারখানা টিকে আছে। কেউ-বা চাঁদা দিতে দিতে পুঁজি হারিয়ে পথে বসেছে, স্থানীয় শহর ছেড়েছে, কিংবা চাঁদা না দিতে পেরে রাজনৈতিক চাঁদাবাজের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে।

উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী বাঙালির মাথায় এর প্রতিবিধানও আবিষ্কৃত হয়েছে। 'যে কোনো একটা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলে ভেড়ো, গলা উঁচিয়ে স্লোগান দাও, অল্প চাঁদাতেই পার পাও।' তাই কেউ-বা ক্ষমতাসীন দলে কৌশলে নাম লিখিয়ে প্রাণ ও ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছে। এ তো প্রতিদিনকার পত্রপত্রিকার নিয়মিত খবর।

শুধু রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী নেতা ও দলীয় 'সোনার ছেলেদের' চাঁদা ও দলন বন্ধ হলেই, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেই, অতি অল্প সময়ে এ দেশ এতদিনে অনেক দূর এগিয়ে যেত। এ দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা ছোট-মাঝারি শিল্প-উদ্যোক্তারা যদি শুধু চাঁদার টাকা না দিয়ে টিকে থাকতে পারতো, চাঁদার টাকা না দিতে পেরে গুলি খেয়ে মরার ভয় না থাকতো, বিনা রাজনৈতিক তদবির ও গোপন লেনদেন ছাড়া ব্যাংক ঋণ পেত, তাহলে স্বাধীনতার পর থেকেই আজ পর্যন্ত প্রচুর ছোট-মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো এবং এতদিনে কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হতো।

এজন্য সরকারি কোনো রাজনৈতিক বচন ও সহযোগিতার দরকার হতো না। সরকারি কোনো অর্থেরও দরকার হতো না। বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান নিজ স্বার্থে অর্থ জোগানোর জন্য এগিয়ে আসতো। আসলে সরকারিভাবে কোনো উন্নয়ন করার দরকার নেই। উন্নয়নের বিজ্ঞাপনেরও দরকার নেই। উন্নয়ন করবে বাঙালির অতুলনীয় মেধা। 'ভিক্ষার দরকার নেই, মা তোমার কুকুর ঠেকাও।' 'চাটার দল' ঠেকাও। রাজনৈতিক চাঁদাবাজ ঠেকাও।

উন্নয়ন করবে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান তার নিজের প্রয়োজনে, নিজের প্রচেষ্টায়। সরকার পরিবেশকে বসবাসের সহায়ক করবে, দুষ্টের দমন করবে, অপশক্তিকে নিরপেক্ষভাবে বিচারের আওতায় আনবে, প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

এটা মনে রাখা দরকার, কোনো শাসক সুবিধাবাদী ব্যক্তি-গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের সহায়তায় শান্তিকামী, ন্যায়সঙ্গত চিন্তাচেতনাকে দমন করে খুব বেশি বছর পেশিবল, অস্ত্রবল, খুন-গুম দিয়ে আটকে রাখতে পারে না। মানুষ সাগরের পানিকেই বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে না, মানুষের মনকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখবে কীভাবে? সাধারণ মানুষ সবই জানে ও বোঝে। তাই ঝুঁকি এড়িয়ে চলে। মানুষকে জয় করতে হয় মন দিয়ে, চরিত্র ও কর্ম দিয়ে– শক্তি ও মিথ্যা বচন দিয়ে কখনোই না, সুবিধাবাদী লোকগুলোকে সুবিধা নেয়ার সুযোগ করে দিয়েও না।

প্রতি বছর জিডিপির হিসাব কষতে কষতে এবং জিডিপির বৃদ্ধি দেখাতে গিয়ে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি খাত, বেসরকারি খাত ও সরকারি খাতকে একসাথে গুলিয়ে ফেলছে। জিডিপি হিসাব করলে ব্যক্তি খাতের জিডিপিকে আলাদা করে দেখাতে পারে। সাথে সরকারি ব্যাংক-বীমা, সরকারি পণ্য-উৎপাদনকারী কর্পোরেশন, সরকারি সেবা উৎপাদনকারী সংস্থা ও সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার মানোন্নয়ন পরিমাপ করে দেখাতে পারে। সরকারি পণ্য ও সেবা খাতের মান বৃদ্ধি এবং দক্ষতার আলাদা হিসাব থাকতে পারে। গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ বিভাগ, আয়কর ও রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, ডাক-তার বিভাগ ইত্যাদি শত শত বিভাগের সিস্টেম লস, লুটপাট বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, শিক্ষা বাণিজ্য, গ্রেফতার বাণিজ্য, চাঁদার বাণিজ্য, প্রশ্নফাঁস বাণিজ্য ইত্যাদির হিসাব রাখতে হবে। একটা মানসম্মত 'এফিসিয়েন্সি ইনডেক্স' তৈরি করে, তার সাথে সরকারি বিভাগগুলোর এফিসিয়েন্সির উন্নতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা যায়। কেবল তখনই প্রকৃত সত্য এবং তথ্য বেরিয়ে আসবে। রাজনৈতিক দলবাজির কারণে, রাজনৈতিক আনুগত্যের আজ্ঞাবাহী হওয়াতে, প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও সেবার মানে কতটা ধস নেমেছে তার হিসাব পাওয়া যাবে।

এ দেশের চিন্তাশীল লোকের এসব বিষয়ে প্রকৃত অবস্থার একটা ভালো ধারণা আছে। অন্য কোনো দেশের লোককে ফলাফলটা দেখালে তাদের চোখ চড়ক গাছে উঠে যাবে। তারা এ দেশের বর্তমান সর্ব-রাজনীতিকীকরণের কুপ্রভাব অনুধাবন করবে। তবে এই পরিমাপের কাজটাও দেশীয় কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থাকে দিয়ে না করানোই ভালো। সেখানেও সিস্টেম লসের সমূহ সম্ভাবনা ও মান নিয়ে টানাটানি বেঁধে যাবে।

এ ধরনের 'এফিসিয়েন্সি ইনডেক্স' তৈরি করলে প্রতিটা সরকারের কর্মোন্নয়ন, কর্মাবনতি বেরিয়ে আসবে। দক্ষতা, অদক্ষতা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে। তখন চমনবাহারি-জর্দার মিশ্রণে পান চিবাতে-চিবাতে লাল ঠোঁটে সরকারিভাবে জিডিপি বৃদ্ধির হাসিমাখা বর্ণনা ও রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রতিটা ক্ষমতাসীন দলের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার প্রায় অর্ধ শতক পরও দুর্নীতির সূচক, উন্নয়নের সূচক, মানবাধিকারের সূচক ইত্যাদিতে সোমালিয়া, ঘানা, ইথিওপিয়া ইত্যাদি খরা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত হতদরিদ্র দেশগুলোর কাতারে নিয়ে প্রতিবার সুজলা-সুফলা বাংলাদেশকে তুলনা করতে মর্মপীড়ার কারণ হয়, বিবেকে বাধে। সূচকে তাদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেলে, হাততালি দেয়ার আসর জমিয়ে দাঁত বের করে হাসতে আরও বিবেকে বাধে। এসব দেখে লজ্জায় গলায় দড়ি পেঁচিয়ে মরতে গেলেও দড়ির দাম বেশি হওয়ায়, তুলনামূলক সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হয়— এখনই মরা ভালো, নাকি আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা ভালো। আবার সেই অপেক্ষা।

প্রত্যেকটা সরকারের উন্নয়নের গতি, বচনের গতি— পুরোনো বিআরটিসি টাটা বাসগুলোর মতো। শব্দের গতি ঘণ্টায় কয়েক হাজার কিলোমিটার, যা এ দেশের প্রতিটা নাগরিকের কর্ণকুহরে নাড়া দেয়, শব্দদূষণ করে। অথচ চলার গতি প্রতি ঘণ্টায় গড়ে টেনেটুনে বারো থেকে তেরো কিলোমিটার। এ গতিতে চললে অনুন্নত দেশের কাতার থেকে উন্নত সমাজ ও দেশ গড়ার পথ পাড়ি দিতে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে হবে। এ জন্ম থেকে জন্মান্তরে পৌঁছাতে হবে। কোরাস ধরে গান গাইতে হবে, "জনম জনম গেল আশা পথ চাহি, মরু মোসাফির বলে, 'আর নাহি নাহি', আশা পথ চাহি ... ।"

উন্নয়নের যেটুকু গলাবাজি হচ্ছে, তা হলো বিশ্বময় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সম্মিলিত ফল। গ্লোবাল ভিলেজে বসবাস করায় আমরাও তার সুফল কিছুটা ভোগ করছি। আর বাকিটা এ দেশের সোনার মাটির অবদান। এতে এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের আদৌ কোনো অবদান নেই। যা অর্জন তা ব্যক্তির অর্জন। বরং রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা সে অর্জনকে শোষণ করে নিজেদের পুষ্ট করছে, কোষাগারের হাঁড়ি কাবার করছে। আর 'সরকারের উন্নয়ন' নাম দিয়ে বগল বাজাচ্ছে।

আমাদের আশপাশের বেশ কিছু দেশ, যেমন— জাপান, থাইল্যান্ড, চীন, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি শুধু মানবসম্পদের উন্নয়ন করে, তাকে উন্নয়নমুখী কর্মধারায় কাজে লাগিয়ে, উন্নয়নের একটা উচ্চতর পর্যায়ে চলে

এসেছে। সেসব দেশ জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের কাঠামোতে ফেলে রাজনীতিকে অপমানসিকতাসম্পন্ন-অপকর্মা ও লুটপাটের মনোলোভা আশ্রয়স্থল তৈরি করেনি।

অথচ এ দেশে উচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটা স্তরে এবং রাজকর্ম থেকে চর্মকর্ম পর্যন্ত প্রতিটা পেশায়, রাজনীতির অঙ্গ সংগঠনের নামে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শাখা-প্রশাখা খুলে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করে রাজনীতিকে একটা ক্ষমতাকেন্দ্রিক সন্ত্রাসনির্ভর আয়-রোজগারি ব্যবসায়ী-পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। জনগোষ্ঠীকে এ পেশায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিনিয়ত আত্মিক ও মানসিক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে ক্রমশই রাজনৈতিক বিষবাষ্পে আচ্ছাদিত করে রাজনৈতিক বিষবৃক্ষের নীচে আশ্রয় নিতে বলা হচ্ছে। ভালো সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। নীতিহীন, চরিত্রহীন, লুটপাটে অভ্যস্ত অনেকেই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিচ্ছে। আশা পূর্ণ হচ্ছে। এ দেশের এই রাজনৈতিক পেশার ক্ষমতা ও কামাই-রোজগার তত্ত্ব এখন সর্বনাশা ও সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ গ্রামভিত্তিক দেশ। রাজনৈতিক হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিটা এলাকায় প্রকট। প্রতিটা অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে ক্ষমতা ও অর্থের ভাগাভাগি। দলে দলে বিদ্বেষ ছড়িয়ে ঘরে ঘরে সামাজিক দ্বন্দ্ব, প্রতিটি পেশায় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে। সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায়, নতুন নতুন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৈরি করা হচ্ছে। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য খেয়াল-খুশিমতো প্রায় অর্ধশতাব্দী পরও স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি বলে ধুয়োজারি গাওয়া হচ্ছে। দোয়াররাও বসন্তের কোকিলের মতো সুরে সুর মেলাচ্ছে। পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও এই সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে কোনো সমাজ সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হতে পারে না। সবকিছুর মূলে এই মতলববাজি রাজনৈতিক কৌশল, বিকৃত রাজনৈতিক চর্চা। এর মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী।

রাজনীতির প্রতিটা দলের শীর্ষমহল ভালোভাবেই বোঝে, এ দেশের সুবিধাবাদী গোষ্ঠী বড়ই ধুরন্ধর। দলে লোক ভেড়াতে হলে, লোক ধরে রাখতে হলে, হাঁড়ি-

চাটার সুবিধা তাদেরকে দিতেই হবে। নইলে রাজনৈতিক ব্যবসা অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে।

ছোটবেলায় গ্রামোফোন রেকর্ডে কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দিনের দরদি সুরে শ্রুতিমধুর গান শুনতাম। একটা গানে, দু-লাইন গাওয়ার পর পরই টেনে টেনে প্রথমাংশ আবার গাইতেন, 'ও কন্যা, কালাপাড়ের ঢেউ, কালায় কালায় কালা করলো হে, ও কন্যা...।' এ দেশের সার্বিক দশাও তাই। অপরাজনীতির জোয়ার আজ কালাপাড়ের ঢেউয়ে পরিণত হয়েছে– জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কালায় কালায় কালা করে ছাড়ছে।

রাজনীতি হওয়ার কথা ছিলো আদর্শভিত্তিক– জনসেবা, সমাজসেবা এবং দেশসেবা। হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত– আত্মভজন, গুরুভজন এবং সন্ত্রাসভজন। জন্ম নিয়েছে ভিন্নধর্মী একটা ধোঁকাবাজ গোষ্ঠী।

ঘাটের দিকে তাকিয়ে বাসের সিটের হাতলে হাত খাড়া করে, তার উপর মুখ রেখে বসে আছি। হঠাৎ আনমনে চোখ গেল এ দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবী সন্তানদের দিকে। সে সাথে মনে পড়ে, এক বৃহস্পতিবারে– সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সামনের বেঞ্চে আমি ও সুদূরী পাশাপাশি বসে আছি। সবার অগোচরে সুদূরী আমাকে একটা রুমাল হাতের মধ্যে গুঁজে দিল। আমি প্যান্টের পাশ-পকেটে রাখলাম। সুদূরী আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একটু হাসলো। আমি সামনের হাইবেঞ্চের উপর আঙুল দিয়ে লিখছি। সুদূরী সেদিকে তাকিয়ে আছে, লেখা বোঝার চেষ্টা করছে। আমি সবে কৈশোর পেরোনো বয়সের আবেগ-মিশ্রিত ভাষায় তাকে লিখে বোঝাচ্ছি, 'আমি তোমারি, ভুলো না আমায়'। সুদূরী ভাবের আবেগে গদগদ হয়ে চোখের ভাষায় আমাকেও বোঝাচ্ছে, সে-ও একই কথা বলতে চায়। পরে রুমালটা বের করে দেখলাম, রুমালের এক কোণে একটা ফুলের ডালে টোনা-টুনির ছবি রঙিন সুতোয় সেলাই করে আঁকা। সে স্মৃতি আজো ভোলার নয়।

দেশব্যবস্থার পিণ্ডি দিতে দিতে সহসাই সুদূরীর সে স্মৃতি মন্থন করছি, সুদূরীকে পিছু ফেলে দূরে ঢাকায় চলে যাচ্ছি– সে মনোব্যথায় ভুগছি, আর এ যুগে স্মৃতির উপমান খুঁজছি। ভেসে আসছে টিভির পর্দায় দেখা চেনা-জানা কিছু জ্ঞানপাপীর

মুখ, শ্রেষ্ঠ মেধাবী সন্তানদের মুখ, যাঁরা তাঁদের সত্য-ন্যায়ের পেশাগত আদর্শ দিয়ে, ধাপ্পাবাজ রাজনৈতিক দলবাজির ঊর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থে উচিত কথা বলে দিতে পারে। তাঁরাও আজ দলবাজিতে ব্যস্ত। দল যত খারাপ কথাই বলুক না কেন, খারাপ কাজই করুক না কেন, তাঁরা নৈতিকতাকে ব্যক্তিস্বার্থের নিগড়ে বেঁধে, চরিত্রকে বিসর্জন দিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন। কখনো রাজনৈতিক সুরে সুর মেলান। রাজনৈতিক দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা পদে অধিষ্ঠিত হন। কেউ-বা বড় কোনো পদে লিয়েনে যান। কেউ-বা দলীয় সুবিধা ভোগের প্রাণপণ চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে অযোগ্য ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। শিক্ষার উন্নয়নে কোনো কাজ না করে সব জায়গায় রাজনৈতিক পদলেহনপ্রয়াসী বক্তব্য দেন। কোনো রাজনৈতিক দলীয় প্রধানদের মিটিংয়ে গিয়ে সামনের আসনে সোফায় বসেন। সোফার ডান পাশের হাতলে ডান হাত খাড়া করে, থুতনিটা তার উপর হেলান দিয়ে প্রধান নেতার মুখের দিকে চাতকের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। ক্যামেরার সামনে পোজ দেন। চোখের অব্যক্ত ভাষায় নেতাকে বোঝাতে চান, ‘আমি তোমারি, ভুলো না আমায়। পারলে আরেকটু বড় পদে আরেকটা পোস্টিং দাও।’ এটা একটা জাতির জন্য যে কতটা দুর্ভাগ্যজনক তা বর্ণনাতীত। টিভির পর্দায় এ জাতীয় ছবি দেখার পর দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়ে হতাশায় ভুগি। উচিত কথা বলা লোকের সংকটে ভুগি। জাতির দিক নির্দেশনাকারীদের অভাবে ভুগি। ভাবি, এ ছবি টিভিতে প্রচারিত হবার রাতেই ঐসব জ্ঞানবিধ্বস্ত পণ্ডিত দোকানে দড়ি কেনার জন্য এটেনডেন্টকে পাঠাননি কেন? আমি এই নদীর ঘাটে দড়ি কিনতে যাওয়া দেখার অপেক্ষায় যেন বাসের মধ্যে তিন ঘণ্টা বসে আছি। রাজনৈতিক আদর্শ এবং লুটপাট, ক্ষমতাদখল, পদদখল, ব্যক্তিতোষণ নীতি, আর সন্ত্রাসের রাজনীতি এক কথা নয়।

এ দেশে শিক্ষার মানের যারপরনাই অবনতি দেখতে দেখতে ‘প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি)’ পরীক্ষা ছাড়াও ক্লাস ওয়ান শুরুর আগে একটা কিছু পাসের আরেকটা সনদ, যেমন– ‘নার্সারি স্কুল সার্টিফিকেট (এনএসসি)’ পরীক্ষা প্রবর্তনের

প্রস্তাবের অপেক্ষা করছি। সে সাথে পাবলিক, প্রাইভেট বা প্রতিযোগিতামূলক যে কোনো একটা পরীক্ষা খুঁজছি যেখানে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় না।

সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে নিয়োজিত অন্তত এই মেধাবী সম্প্রদায়ও যদি শিক্ষা ও দেশ নিয়ে একটু ভালো কিছু ভাবতো! দলবাজি ও আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতায় অংশ না নিয়ে, দলমত নির্বিশেষে শিক্ষাদর্শ ও পেশাগত নৈতিকতায় বলীয়ান হয়ে জাতীয় স্বার্থে উচিত বাক্যগুলো উচ্চারণ করার যোগ্যতা দেখাতে পারতো, তাহলে জাতি এই চলমান দুর্গতি থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পেত।

অবশেষে বাস ফেরিতে উঠলো। দেশ-ব্যবস্থার পিণ্ডিদানে ছেদ পড়লো। আমি ফেরির উপরতলায় গিয়ে একপ্রান্তে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়েছি। ঝিরঝির করে উন্মুক্ত হাওয়া বয়ে চলেছে। নদীতে কোথাও কোথাও চর। ফেরিগুলো এঁকেবেঁকে চলছে। সেলফোনে মেসেজ এলো, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রচারের জন্য লিখেছে, ‘নদী বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে।’ মনে হলো, তাহলে নদী মরলে কি বাংলাদেশও মরবে? মনে প্রশ্ন, এ পদ্মা নদী মরছে কেন? কে একে মেরেছে? এ নদীর পানি গেল কোথায়? নদীর এ অবস্থার জন্য কে দায়ী— তা কেউ বলে না কেন? পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কি এ দেশের পানির ইতিহাস জানে? যদি জানেই, তবে প্রচারের জন্য এ বদহজমি বাক্য পাঠায় কেন?

ভাবছি, এ সময় সুদূরী যদি পাশে থাকতো! সুদূরী খুব বেড়াতে ভালোবাসে। উদ্দাম হাওয়ায় নদীর বয়ে চলা, জেলেদের মাছ ধরা, দু পাশের ধু-ধু প্রান্তর— পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে দুজনে ফেরি পার হতাম। কত ভালোই না লাগতো! এ জীবনে কি তা আর সম্ভব? শরীরের যে অবস্থা, আবার কি এ পথে এভাবে যাওয়া হবে? আবার ভাবছি, ‘যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরিয়ে আনা যায়! পথের মাঝে পথ হারালে আর কি পাওয়া যায়!’

নদীর মাঝখানে বিস্তীর্ণ বালুচর, ড্রেজিং করে দুটো গতিপথ তৈরি করা হয়েছে। একটা ঘাটের দিকে গেছে, অন্যটা অনেক দূরে বয়ে চলে গেছে। নদীর গতিময়তা দু ভাগ হয়ে গেছে— ঠিক যেন আমার ও সুদূরীর বয়ে-চলা জীবনের মতো।

একটু পিছনে আরেকটা ফেরি আসছে। মনে হচ্ছে, পিছনের ফেরিতে কোনো পিকনিকের বাস উঠেছে। বাসের ছাদে সেট-করা মাইক থেকে গান ভেসে

আসছে। বাতাস কখনো গানটার সুর অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে– কখনো আবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে:

‘নদী কোন ভরসায় পথ করিলি সার
তোর জীবন যৌবন সব হারালি কূলের অহঙ্কার,
তুই সুখের স্রোতে নাইতে এসে বুক ভাসালি হায়–
তোর কোনো কি ব্যথার দোসর নাই,
নদী রে ... ।
তোর সারা জনম একলা পথে পথেই কেটে যায়।
নদী ভালোবাসার এমনই ধারা হয়–
তুই হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাবি এমন কথা নয়,
তুই ভুল করেছিস ভালোবেসে ঘর বাঁধা কি যায়?
তোর কোনো কি ব্যথার দোসর নাই,
নদী রে ... ।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীচে নেমে এলাম। নেমে আসার আগে একবার ভাবলাম, এই জীবনের বেলাশেষে এসে আমি এ কী ভাবছি? এ ভাবনা কি আমার ঠিক হচ্ছে? ভাবলাম, জীবন তো চিরসবুজ, চুলগুলোই না হয় পুরো সাদা হয়েছে– মনটা তো সেই চিরনতুন, চিরশ্যামল।

ফেরির পিছনে তখন ইঞ্জিনের তুমুল গর্জন। বাইরের কোনো কথা চিৎকার করলেও শোনা যাচ্ছে না। এবার ফেরি ঘাটে এসে পৌঁছেছে। এখনই বাস ছেড়ে দেবে। সন্ধ্যা নেমে আসবে অল্প সময়ের মধ্যেই।

গাড়ি রাস্তা বেয়ে চলেছে। রাস্তার দু পাশে খাদ, জলাভূমি। নীচু অঞ্চল। অনেক মাটি তুলে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। পাঁচ-সাত মাইল আসার পর পরই রাস্তার দু পাশ ঘিরে ছোট ছোট বাজার, নদী, খাল– ছোট বড় মিলিয়ে ঘন ঘন ব্রিজ। নামেই হাইওয়ে, পথে রিক্সা ভ্যান, টেম্পুর ছড়াছড়ি। মানিকগঞ্জ এসে গাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে আর এগোয় না। গাড়ি হর্ন দিতে থাকে। পাকা রাস্তার দু পাশে অনেক জায়গা, তারপর দোকানপাট। রাস্তার পাশ ঘেঁষে ট্রাকগুলো দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। তারপরেও পাশে কিছু জায়গা আছে, যেখানে

দাঁড়িয়ে লোকাল গাড়িগুলো যাত্রী উঠানো-নামানো করাতে পারে। তা না-করে অভ্যাসের কারণে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে যার যার মতো যাত্রী উঠাচ্ছে-নামাচ্ছে। বলার কেউ নেই। কখনো পুলিশ কিছু বলে সরায়। আবারো মাঝপথে দাঁড়ায়। পুলিশেরও একটা বুঝ এসেছে, ওরা তো দাঁড়াবেই, এটাই দেশীয় নিয়ম। যুগ যুগ ধরে নিয়ম চলে আসছে। দেশীয় নিয়মের ব্যতিক্রমই-বা তারা করবে কেন?

অনেকক্ষণ গাড়ি হর্ন দেয়ার পর সামনে এগোলো। ধামরাই এলো, একই অবস্থা। গাড়ি আর এগোয় না। গাড়ির হর্ন বাজতে থাকলো। বড় লাইন, বেশ সময় কেটে গেল। আবার এগোলো। এবার নবীনগর তেমাথার পালা। আধা-মাইল আগ থেকেই গাড়ি আর চলে না। দশ-পা এগোয়, আবার থামে। গাড়ির যাত্রীরা কেউ কেউ নিশ্চিত মনে সিটে বসে ঘুমাচ্ছে। কেউ-বা চোখ মেলে জানালা দিয়ে এদিক-ওদিক উঁকি মারছে। কেউ গুনগুন করে গান গাচ্ছে, 'গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে, গাড়ি ...।' অনেকের কোনো মন্তব্য নেই। এটাই তো স্বাভাবিক। যতবার ঢাকায় আসা-যাওয়া করে, এভাবেই যায়। এটাই এ দেশের নিয়ম। সবাই এতে অভ্যস্ত। এই অভ্যস্ততাই আমাদের অভিশাপ।

আমি কন্ডাকটরকে বললাম, 'কন্ডাকটর সাহেব, আমি একটু সামনে হাঁটবো, ঐ তেমাথায় গিয়ে উঠবো। আমাকে ওখান থেকে উঠিয়ে নিতে ভুলবেন না যেন।' কন্ডাকটর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। হাঁটা শুরু করলাম। আসা এবং যাওয়ার রাস্তার দু দিকেই গাড়ি দাঁড়িয়ে। আরো সামনে এগিয়ে তেমাথা পর্যন্ত এলাম। দেখলাম, অনেক গাড়ি রাস্তা ক্রস করে উত্তরের রাস্তায় যেতে চায়। ঢাকাগামী গাড়িগুলোও ক্রসিংয়ের জায়গা ফাঁকা না রেখে প্রতিটা গাড়ির পিছন পিছন দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর দিকে যাবার গাড়িগুলো রাস্তা ক্রস করতে পারছে না, তাই দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর দিকে যাবার গাড়িগুলো না যেতে পারার কারণে সোজা-আরিচাগামী গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ফলে দু দিককার রাস্তায় চরম ট্রাফিক জ্যাম।

তেমাথা পেরিয়েও বেশ সামনে চলে এলাম। রাস্তার দু পাশের লেনগুলোতে খালি জায়গায় বেশ কিছু লোকাল গাড়ি ড্রাইভারবিহীন দাঁড়িয়ে আছে। এখন গাড়ি যাবার দুটো লেন। দুটো লেন জুড়েই আট-দশটা ঢাকাগামী লোকাল গাড়ি দাঁড়িয়ে সিট খালি, রড খালি, ঘাড় খালি, মাথা খালি বলে চিৎকার করছে। কারো হেলপার

বলছে, 'সিট খালি, রড খালি,' আবার কারো হেলপার হাঁকছে 'ঘাড় খালি, মাথা খালি', দু-তিন পা সামনে এগোচ্ছে আবার থামছে। এভাবে যাত্রী আকর্ষণ করারও দেখলাম ওদের একটা টেকনিক আছে, চলারও ছন্দ আছে। বলার কেউ নেই।

আমি বিধাতাকে ডাকলাম, 'বিধাতা, তুমি ফেরেস্তা পাঠাও, এবারের মতো রক্ষে করো! অথবা ওদের পথ ছেড়ে রেখে যাত্রী নেবার মতো মন দাও, মানসিকতার পরিবর্তন করো।' বিধাতা আমার এ ফরিয়াদ শুনলো বলে মনে হলো না। এদিক-ওদিক তাকালাম। দেখলাম, হয়তো-বা কোটি টাকা খরচ করে, সুন্দর সিরামিক-ইট ব্যবহার করে অনেকগুলো লেন বসানো হয়েছে। সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য কোনো কোনো লেনের মাঝে জায়গা রেখে উঁচু ঢিপি করা হয়েছে, দামী ঘাস লাগানো হয়েছে, আবার আবর্জনায়ও ভরে গেছে। যা করা হয়নি সেটা হলো, ঐ গোষ্ঠীটার মানসিকতার উন্নয়ন, নিয়ম মানার ব্যবস্থা। আবার ঐ গোষ্ঠীটার মানসিকতার পরিবর্তনের আগে ওদের পালক-পিতাদের মানসিকতার পরিবর্তন অপরিহার্য। এমন করতে করতে যখন একটা লেন একটু ফাঁকা হবে, তখন দূরের গাড়িগুলো আস্তে আস্তে এগোবে।

এভাবেই দিন যায়– রাত আসে, মাস যায়– বছর আসে। যুগ পেরিয়ে যায়– এ নিয়মেই চলে। এতেই সবাই অভ্যস্ত। এ জাতীয় সমস্যাগুলোর সংখ্যা প্রচুর। প্রতিটাই নিজেদের তৈরিকৃত সমস্যা। এসব সমস্যাকে আমরা ইচ্ছা করলেই 'অতীত কাল'-এ রূপান্তরিত করতে পারি। কিন্তু তা করিনে, কেউ এগিয়ে আসিনে– প্রতিবাদও করিনে, 'নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল' বলে বাক্যে নিয়মিত ব্যবহার করি। যদি কখনো কোনো পতাকাবাহী গাড়ি এ রাস্তায় যায়, কেবল তখনই বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করি।

কোনো ব্যক্তির প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও প্রতিবাদ করতে পারবেন না। আপনার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে, আপনি এর প্রতিবাদ করবেন? ঐ রকম প্রতিটা গাড়ির সামনের সিটের নীচে লাঠি, রড গোপনে রাখা আছে। কিছু বললেই তারা এগুলো নিয়ে আপনার দিকে তেড়ে আসবে। বেশি কিছু বললে আপনার ঘাড়ও

ভাঙবে, আবার সামনের অন্য গাড়িও বেপরোয়া ভাংচুর শুরু করে দেবে। পুলিশও ওদের কিছু বলবে না। মাসোহারার ব্যাপার-ট্যাপার আছে না! আবার ওরা কোন দলের, সেটাও পুলিশ ভালো করেই জানে। এমপি-মন্ত্রীরাই পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতা। 'পাঁঠা কোঁদে খুঁটোর জোরে।' ওরা প্রধান রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের সাথে জড়িত। ওরাই রাজনৈতিক নেতাদের লাঠি-শক্তি। রাজনৈতিক সংগঠন ওদের ন্যায়-অন্যায় সবকিছুতেই ছায়া দেবে। ওরা মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে যতক্ষণ খুশি সময় নিয়ে যাত্রী উঠিয়ে-নামিয়ে অভ্যস্ত। ওদের আছে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা খাটানোর স্বাধীনতা। ওরা ওদের ইচ্ছেমতো স্বাধীনতা ভোগ করার একচ্ছত্র দাবিদার(?)। আপনার ব্যক্তিস্বাধীনতা ওদের কাছে তুচ্ছ, উপেক্ষিত। আমরা বাসের মধ্যে বসে থেকে রাস্তাটুকু পার হবার অপেক্ষায় অভ্যস্ত। পিছনে কত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের কত ভোগান্তি হচ্ছে, এ বিবেক ও বিবেচনাশক্তি ওদেরও নেই, ওদের পালক-পিতাদেরও নেই। পালক-পিতারা সর্বাবস্থায় ওদের সাথে আছে।

এভাবে হাজার অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পক্ষের বিকৃত মানসিকতা পুরো সমাজটাকে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে। জনভোগান্তিকে চরমে এনেছে। সবকিছুকে অক্টোপাসের মতো চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে আছে। এ অক্টোপাসের নাগালমুক্ত হবার অপেক্ষা।

বাস এক সময় সাভার বাজারে এলো— একই অবস্থা, হেমায়েতপুর এলো— একই অবস্থা, গাবতলী এলো— একই অবস্থা। আমার মনেরও একই অবস্থা— অসহনীয় অবস্থা। মুক্তিযুদ্ধ দেশ মুক্ত করেছে, কিন্তু দেশ-চালকরাই যদি জঞ্জাল সৃষ্টিকারী, বিকৃত ও বিকল মানসিকতাসম্পন্ন হয়, সকল অন্যায় ও অব্যবস্থার হোতা হয়, তবে সে জঞ্জাল মুক্ত করবে কে? নিশ্চয়ই তা মুক্ত করার জন্য বিধাতা নীচে নেমে আসবে না। বিধাতার সুদৃষ্টির অপেক্ষা।

বারো

বাসায় এসে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছি। কখন যেন ঘুম এসে গেছে। রাতে স্বপ্নে দেখছি— সেলিম ভাই, আমি আর সুদূরী কোথায় যেন যাচ্ছি। কত বন-বাদাড়, জনপথ পেরিয়ে এক পাহাড়ের কাছে তিনজন এসে দাঁড়িয়েছি। সেলিম ভাই আগে আগে পাহাড় বেয়ে উঠে যাচ্ছে। আমি মাঝামাঝি। সুদূরীকে হাত ধরে টেনে উঠাচ্ছি। সুদূরীকে টেনে উঠাতে গিয়ে ভীষণভাবে হাঁপিয়ে গেছি। সুদূরী আমার হাত কিছুতেই ছাড়ছে না। বার বার বলছে, 'আমাকে তুলে নাও, তোমার সাথে নাও। আমি এত উপরে একাকী উঠতে পারবো না। তুমি যেন আমাকে ফেলে চলে যেও না।' আমি সেলিম ভাইকে পিছ থেকে ডাকছি। একটু আস্তে উঠতে বলছি। পাহাড়ের ওপারে হাজার হাজার লোকের কোলাহল, হৈ-চৈ শুনতে পাচ্ছি। সেলিম ভাইকে জিজ্ঞেস করছি, 'ওপারে ওরা কারা এত চেঁচামেচি করছে?' সেলিম ভাই বলছে, 'ওরা আমার দলের লোক, ওরা আমরা। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে যাদের অপমৃত্যু হয়েছে, ওরা তারা। আমি ওদের নেতা। তুই দেরি করিসনে, আমার সাথে চলে আয়। তুইও তো অর্ধমৃত হয়ে বেঁচে আছিস, ইচ্ছে করলে আমাদের দলে নাম লেখাতে পারবি, চলে আয়।'

ঘুম ভেঙে দেখি আসলেই হাঁপাচ্ছি। একটু একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসছে। বাকি রাতটা বসেই কাটিয়ে দিয়েছি।

সকাল হয়েছে, বিছানা ছেড়েছি। আজ আর অফিসে যাব না, ভেবেছি। দরজার নীচ দিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে দৈনিক পত্রিকা দিয়ে গেছে। অনেক পত্রিকা জমেছে। প্রতিটার হেড লাইনে অন্তত একবার চোখ বোলানো দরকার।

প্রতিটা পত্রিকাতেই খুনের ঘটনা, লাশের ছবি, ক্রসফায়ারে মরা আদম সন্তানের ছবি। গুমের ঘটনা। একগাদা পত্রিকায় জড়ো হওয়া একগাদা লাশ।

প্রতিদিন সকালে পত্রিকা পড়ি। তারপর বিকেল হয়ে রাত আসে, রাতে ঘুমাই, আগের দিনের অনেক ঘটনা ও ছবি ভুলে যাই। পরদিন সকালে আবার পড়ি। খুন ও গুমের ঘটনা পড়তে পড়তে গা-সওয়া হয়ে গেছে। খুন-খারাবির ছবি অনেক

বছর ধরেই তো পত্রিকায় দেখছি, পড়ছি কিন্তু মনে এতটা নাড়া দেয়নি। আজ বেশ ক দিনের পত্রিকা একসাথে পড়ছি, পত্রিকার উপর পত্রিকা রাখছি। তাই লাশের গাদা, ক্রসফায়ারের সাপ্তাহিক সমাবেশ। শুধু ক্রসফায়ার আর ক্রসফায়ার। পত্রিকার এ-সম্পর্কিত পুরো সংবাদটা পড়া লাগে না। গৎবাঁধা একই কথা। শুধু নামটা বদল, আর ঠিকানাটা ভিন্ন। পাঠকরা যেন অবোধ বাচ্চা, কিছুই বোঝে না— এমন ভেবে লেখা। বার বার আসামিটাই পালাতে যায়, আর হাতবাঁধা অবস্থায় গুলি খেয়ে মরে। না-ধরতে পারা সন্ত্রাসী(?)দের হাত খোলা থাকে বলে, হাত দিয়ে তারা গুলি ঠেকিয়ে দিয়ে পালায়। আর হাতবাঁধা হতভাগ্য অসহায় সন্ত্রাসী(?) হাত বাঁধা থাকার কারণে গুলি ঠেকাতে না-পেরে গুলি খেয়ে মরে। অগণিত চিহ্নিত দাগী-সন্ত্রাসী অনুকূল রাজনীতির ছায়াতলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, প্রতিপক্ষকে ক্রসফায়ারের হুমকি দিচ্ছে, আর প্রতিকূল রাজনীতির রঙমাখা কালাচাঁদ-ধলাচাঁদ ক্রসফায়ারে মরছে।

কখনো ধৃত ব্যক্তির পরিবার বলে, একটা চিহ্নিত বাহিনীর পরিচয় দিয়ে, অস্ত্র ঠেকিয়ে ধরে নিয়ে গেছে, বেশ কিছুদিন কোথাও খোঁজ নেই। হঠাৎ কোনো খালের ধারে কিংবা মাঠে লাশ পড়ে আছে। কীভাবে মরলো কেউ স্বীকার করে না, স্বীকার করার দরকারও পড়ে না। দিন চলে যায়, যে যায় সে-ই যায়। কেন যায়, বলে যায় না— অজানাই রয়ে যায়। চিহ্নিত বাহিনীর কথার সাথে পরিবারের কথার কোনো মিল থাকে না, তবু দিন চলে যায়। সবাই বোঝে, কিন্তু বুঝেও বোঝে না। এ দেশে এ আবার কেমন শাসন ও বিচারব্যবস্থা, যে বিচারব্যবস্থার অনেক কাজই অনুকূল সন্ত্রাসীবাহিনী করে দিচ্ছে, বিচার বিভাগ পর্যন্ত যাবার আগেই বিচার শেষ?

লাশের ছবি পত্রিকায় ছাপানোর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার বিকল্প একটা বুদ্ধি বেরিয়েছে— 'নিরুদ্দেশ বা গুম'। গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে ছোট-বড় সব শ্রেণীর মানুষের মুখে একটা শব্দ মুখস্থ হয়ে গেছে 'গুম'। দেশব্যাপী গুম। সাদা পোশাকে একদল লোক এসে কাউকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পাশে থাকা লোকগুলো চিনে ফেলে, এরা কারা। আপনজনকে এহেন দুর্বিপাকে 'যেতে দিতে ইচ্ছা নাহি, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়'। ওরা গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এ দেশে কার বুকের এতো পাটা যে বলে, 'যেতে আমি দেব না তোমায়।' উঠিয়ে নেয়া লোকটাকে আর কোথাও

খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ, লাপাত্তা– অগস্ত্য যাত্রা। তাকে খুঁজে বের করতে, তথ্য দিতে থানার অনীহা, উদাসীনতা। দায়বদ্ধতা বেশি হলে, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার মতো করে একটা অনিচ্ছুক কল্পিত বিবৃতি।

পত্রিকায় সরজমিন রিপোর্টে একাধিকবার চোখে পড়েছে– রাজধানীর পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেত, নদী-নালা, ডোবায় চোখ রাখা ভয়ের ব্যাপার। শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল। কখনো নারায়ণগঞ্জের পাশের নদীতে একসাথে পরপর সাতটা পর্যন্ত লাশ ভেসে ওঠে। লাশ সাধারণত পাওয়া যায় না, তাই কারো দোষ-গুণ, বাস্তবতা আলোচনায় আসে না, ঘটনার ভয়াবহতাও বোঝা যায় না। তাই হন্তারকও পার পেয়ে যায়। যারা এ পর্যন্ত নিখোঁজ, তারা কতটুকু দোষী-নির্দোষ, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই হয়তো লাশগুলো ভেসে উঠেছে। হাজার হাজার বাস্তব ঘটনার কালসাক্ষী হয়ে বেরসিক-বেকুব লাশগুলো হয়তো এ দেশের স্বাধীন মানুষের ভোঁতা-হয়ে-যাওয়া বিবেককে পরিহাস করার জন্য ভেসে উঠেছে– বিচার পাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই নয়। বিচার নিয়ে তাদের আর কী হবে? তারা তো আর ফিরে আসতে পারবে না। তাই শত-সহস্র হত্যা-গুমের মধ্যে দু-একজনের বিচার করা প্রহসনের নামান্তর। মাথা কেটে ফেলে দিয়ে টাকের যত্ন নেয়ার শামিল। কত নির্দোষ অসহায় মানুষ যে জীবন্মৃত মানুষের ভোঁতা বিবেককে উপহাস করতে চায়নি, তাই ভেসে না-উঠে চিরতরে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবে গেছে বা এখনো যাচ্ছে– তার হিসাব কে রাখে! আমার জানা নেই, এই ভাগ্যাহত, বিচারবঞ্চিত কথিত সন্ত্রাসী(?)দের কোনো আপনজন, সন্তান-সন্ততি আছে কিনা! তাদের দুর্বিষহ স্মৃতি, ভগ্নদশা জীবনযাপন, অসহায় মুখখানা, আপনজন হারানোর আহাজারি আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে, তাদের সাথে নিরিবিলি বসে ভাববিনিময় করতে ইচ্ছে করে। তাদের অনুভূতির সাথে আমার সালামাত চাচা-চাচির অনুভূতি ও জীবন-যাপন মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

সেলিম ভাই হয়তো আমার ভোঁতা বিবেককে বার বার নাড়া দেয়ার জন্য মাঝেমধ্যেই স্বপ্নে আমার কাছে আসে, দেখা দেয়। হয়তো বলতে চায়, ‘সজীব, তুই কিছু একটা বল। আমি না তোর খেলার সাথী ছিলাম, রাতে মাঠে পালিয়ে থাকার সাথী ছিলাম। আমি কতটুকু দোষী, তুই তো জানিস– তুই একটা কিছু বল।’

জীবনের বেলাশেষে এসে আর বুঝে পারিনে, 'ভালো আছি'— এ কথা বলার আত্মপ্রবঞ্চনা রাখবো কোথায়! সেলিম ভাইকে আমি কী উত্তর দেব! এত চেষ্টা করেও, এতবার হোমিও ওষুধ খেয়েও প্রায় রাতেই সেলিম ভাইয়ের আসা বন্ধ করতে পারলাম না। তবু আসে, প্রায় রাতেই আসে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে এসেও 'স্বাধীনতা' শব্দটা শিশু ভোলানো শব্দের মতো মুখরোচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করে রাজনীতি(?) করছি। স্বাধীনতার চেতনার বিজ্ঞাপনের আড়ালে ক্ষমতার মসনদ গড়ছি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের নিগড়ে দেশকে বাঁধছি। দেড়েল-অদেড়েল, আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে বিনা বিচারে মানুষ মারছি। জলজ্যান্ত মানুষ দিনে-দুপুরে বেমালুম গায়েব করে দেয়ার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা হাতে পেয়েছি। যত অন্যায়-অবিচার সাধারণ মানুষের সহ্যের সীমায় চলে এসেছে। বিবেক ও মনুষ্যত্ব অস্তিত্বশূন্য হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শোষণ ও বঞ্চনার ঘানি টেনে ক্ষমতার তৃপ্তি উপভোগ করছি।

সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করে কখনো ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী, কখনো পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল, শান্তিতে বসবাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি, 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে' প্রবচনই সার হয়েছে।

এবার বাড়িতে গিয়ে মা-বাপের কবর জেয়ারত করেছি। অনেকক্ষণ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি। মা-র মুখে কথা থাকলে নিশ্চয়ই উনি বলতেন, 'এখানে এসেছিস কেন? দেশে ফিরে এসেছিস কেন? তাড়াতাড়ি আবার বিদেশে চলে যা, সামনে থেকে যা। তোকে না সেই ছোটবেলা থেকেই শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বের করে দিয়েছিলাম। বিদেশে গিয়ে প্রয়োজনে ঝাড়ুদারের কাজ করে খাবি, তবু দেশে ফিরবিনে।'

রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উপাদান মানুষ— এ তত্ত্ব আমি ক্লাস এইটের বইতে পড়েছিলাম। মানুষ না থাকলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকে না। ধনী-নির্ধন, সন্ত্রাসী-দরবেশ, সাধারণ-অসাধারণ সবাই রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় নেবে। রাষ্ট্র সবার জিম্মাদার। আইন বিভাগ ও জেলখানা নামক রাষ্ট্রীয় আশ্রয় সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কেউ কোনো অন্যায় করলে, আইন ও জেল-হেফাজতে রেখে রাষ্ট্র তার সুষ্ঠু বিচার করবে। সেই রাষ্ট্রই

যদি নিজ সন্তানকে রক্ষা করতে না পারে, কিংবা না চায়, বা যদি কোনো রাজনৈতিক দলের হাতে বিচার ছেড়ে দেয়, রাজনৈতিক দলই হয় রাষ্ট্রের আশ্রয়ে থাকা সন্তান-হন্তারক— সেক্ষেত্রে, মানুষ কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? এ তো বনবিড়ালের কাছে মুরগি পুষতে দেয়ার শামিল। এ আবার কেমন রাষ্ট্রে জন্মালাম, যে রাষ্ট্র মানুষকে নিরাপত্তা না দিয়ে— নিরাপত্তা কেড়ে নেয়!

এসব দেখে অসংখ্য মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত লোকজন বেশ কয়েক বছর ধরে খুব বেশি মাত্রায় দেশান্তরী হচ্ছে। যারা মধ্যপ্রাচ্য কিংবা মালয়েশিয়ার মতো দেশে শ্রমজীবী হিসেবে যায়, তারা মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে আসে। উচ্চ-মেধাবী লোক অধিকাংশই চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছে। মেধা 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র তলা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ে যাচ্ছে। ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের একটাই লক্ষ্য, কত তাড়াতাড়ি পাস করে দেশ ছাড়া যায়। যাদের মেধা দেখিয়ে যাবার রাস্তা নেই, তারা অন্য যে কোনোভাবে, এমনকি নৌকায় চড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর-মহাসাগর পেরোতে চায়। যেন এ দেশে থাকার তুলনায় সাগরে ডুবে মরা কিংবা অন্য কোনো দেশের গণকবরে স্থান করে নেয়া অনেক উত্তম। যাদের কোনোই মাধ্যম নেই তারা যায় দিনমজুর, উটের রাখাল, ঝাড়ুদারের পারমিট নিয়ে।

আমার এক সহকর্মীর কথা বলি। ঢাকায় ধানমণ্ডিতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দশ কাঠা জমির উপর শ্বশুরবাড়ি। তার বাবারও অঢেল সম্পত্তি। আত্মীয়-স্বজন সুপ্রতিষ্ঠিত। সুশিক্ষিত, নীতিবান পরিবারের সন্তান। দেশের ক্রমাবনতিশীল দুরবস্থা দেখে আগে একবার সুর উঠিয়েছিল বিদেশে পাড়ি দেবে। শ্বশুর-শাশুড়ি বাধা দিয়েছিলেন। এই তিন বছর হলো শ্বশুর-শাশুড়ি মোটামুটি জোর করে একমাত্র ছেলে-বউমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'যা, এখান থেকে কেটে পড়, গিয়ে চেষ্টা কর আমাদেরকেও নিয়ে যাবার। এ দেশে জীবনের নিরাপত্তা নেই। জীবনটা বাঁচা।' সহকর্মী একদিন এসে ঘটনাটা আমাকে খুলে বললো, জলছলছল চোখে বিদায় নিল। এক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে পাড়ি দিল। সবাই বিদেশে টাকা উপায়ের জন্য যায় না, শান্তিতে নির্ঝঞ্ঝাট বসবাসের জন্যও অনেকে যায়। এ হলো শত শত দেশত্যাগীর দেশান্তরী হবার নিজ চোখে দেখা ঘটনার মাত্র একটা দৃষ্টান্ত।

যৌবনের প্রারম্ভে পড়েছিলাম, একটা জাতিকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমেই সে জাতির শিক্ষাকে ধ্বংস করতে হয়। তারপর তার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে।

শিক্ষাব্যবস্থা ইতোমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে। জাতীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতিবোধ, ভালো-মন্দ বিশ্লেষণবোধ, নৈতিকতাবোধ ও আত্মোপলব্ধিবোধেরও শেষ অবস্থা। শুধু অতিমেধাবী কিছু ছাত্র-ছাত্রী মেধার জোরে ও পারিবারিক পরিবেশের কারণে উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে। তাছাড়া, বাকি সবাই অর্থহীন মন্ত্র শেখার মতো নোট ও গাইড মুখস্থ করে, নকলের আশ্রয় নিয়ে নামিক সার্টিফিকেটধারী হচ্ছে। পরীক্ষা শেষে মুখস্থ মন্ত্র ভুলে যাচ্ছে। এ শিক্ষা শিক্ষাহীনতার নামান্তর। থুতু ফেলতে জানে না, টয়লেট ব্যবহার করতে জানে না। তিন বন্ধু ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে, পথচারীদের পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছে– রাস্তা ছেড়ে পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়, সেটাও বোঝে না, অথচ পকেটে সার্টিফিকেট। তাদের মধ্যে সুস্থ চিন্তাধারা, আত্মবিশ্লেষণ ও সুশিক্ষার বিকাশ কোথায়? ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যবোধ কোথায়? জ্ঞানার্জনের পিপাসা কোথায়? অন্যায়ের নিরপেক্ষ প্রতিবাদ কোথায়?

যুবসমাজের আরেকটা বড় অংশের হাতে মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার তুলে দেয়া হয়েছে। তারা এগুলোর অপব্যবহার করে অপসংস্কৃতির তালে তালে মাথা ঝাকাচ্ছে আর মূল্যবান জীবনকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। অথচ এরাই সুশিক্ষা পেলে ঐ কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনের ভালো ব্যবহার ও টেকনোলজির উন্নয়ন করে জীবনকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারতো। তাদেরকে জীবনের শুরুতেই অশিক্ষা-কুশিক্ষা, প্রতিকূল পরিবেশ দিয়ে জীবনের সুস্থ চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত করা হয়ে গেছে। যুবসমাজের একটা অংশ বরাবরই সুবিধাবাদী চরিত্রের হয়ে থাকে। বিভিন্ন অপরাজনীতির ছবক দিয়ে ক্ষমতা ও অর্থশালী হবার বাধাহীন সুযোগ করে দিতে পারলেই তাদেরকে পাওয়া যায়। এ প্রক্রিয়া দেশে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। দিন যত সামনের দিকে যাচ্ছে সুযোগ-সুবিধার আওতা তত বাড়ছে। এ প্রক্রিয়া অনিবারণীয়। কোনোকিছুকে ধ্বংস করা খুব সহজ, ফিরিয়ে আনা দুরপনেয়। পদ্ধতি বদল ছাড়া এ থেকে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর।

আমিও সেই কৈশোর থেকে সরকারি ও গোপন বাহিনীর মদদপুষ্ট সম্পত্তিপিপাসু দুরাচারদের রোষানলে পড়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে সুখ-শান্তির আশা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি। অত্যাচারের বিভীষিকাময় ঘটনাগুলো আমাকে করেছে ঘরছাড়া,

মা-ছাড়া, কখনো দেশছাড়া। আর সুদূরীর বিচ্ছেদ আমাকে করেছে জনমদুঃখী ও ছন্নছাড়া। সুদূরীর কাছে আমি অবিশ্বাসী হয়েছি। অনেকবার দেশান্তরী হতে চেয়েছি, কখনো বিদেশে চলে গেছি। আবার ফিরে এসেছি মা-মাটির গন্ধ, হেঁটে যাওয়া পথ, সাহেদ মাস্টারের মতো স্বজনদের সঙ্গ ও সুদূরীর টানে। এ মাটিই যে আমার শেষ ঠিকানা। ভেবেছি, সুদূরী যে দেশে আছে, আমাকেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও সে দেশেই থাকতে হবে। দূরে দূরে থাকলেও থাকতে হবে। সুদূরী যে পথ দিয়ে হাঁটে, আমাকেও সে পথ দিয়ে হাঁটতে হবে। একদিন হয়তো অকস্মাৎ একবার দেখা হয়ে যাবে। আমি কখনই আত্মপক্ষ সমর্থন করবো না। আমি তার ভুল ভাঙাতে যাব না। তাকে একবার দেখাটাই আমার পরম পাওয়া। সুখে আছে, ভালো আছে জানাটাই আমার সান্ত্বনা। এই আমার পথ চলা। অনেক চেষ্টা করেও স্মৃতিগুলো মুছে ফেলতে পারিনে, এটাই আমার অপারগতা।

শরতের মেঘে মেঘে মিলনসেতু বেঁধেছিল জানি না কভু
বারে বারে সে আশায় উড়ে ফিরি আজো তবু,
ভরা বানে ভাসিয়ে দু কূল উন্মনা নদী বয়
হারানো দিনের পুরোনো কথা স্রোতে ভেসে যায়,
মিছে আশায় প্রাসাদ গড়ি, কখনো গড়ি খেলাঘর
সমস্ত হৃদয় জুড়ে, অবিমিশ্র জীবনভর–
শত আশা, শত ব্যথা, শত পাওয়া না-পাওয়ার ভিড়ে
অম্লান, নিখাদ-বিমলিন সে স্মৃতি– শুধু তোমাকেই মনে পড়ে।

কৈশোরে নানি আমাকে একটা গোপন তথ্য দিয়েছিলেন। আজো বলা হয়নি। আমার যখন জন্ম হয়, মা চেয়েছিলেন আমার মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে নিজেও আত্মহত্যা করতে। মা কাউকে কিছুই বলেননি। বিষ সংগ্রহ করে ছোট্ট একটা গ্লাসে রেখে দিয়েছেন। আমি জন্ম নেয়ার সাথে সাথেই মা ম্যাচ জ্বেলে ল্যাম্পটা ধরাতে গেছেন। তাড়াহুড়ো করে ম্যাচ খুঁজতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় বিষের গ্লাস মাটির মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে গেছে। আমার কান্নার শব্দে নানি এসে ঘরে উপস্থিত।

সন্তান জন্ম নিলে আমাদের এলাকায় মুখে মধু দেওয়ার প্রচলন ছিল। মা আমার মুখে কেন জানি বিষ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সেজন্যই মনে হয় আজীবন এত দুর্মুখ, স্পষ্টভাষী হয়েছি। মধুভাষী হতে অনেক চেষ্টা করেছি। আজন্ম আমার মুখ

দিয়ে কোনো সুমধুর কথা বেরোয়নি। সবসময় বিষেভরা কথা। এটা আমার জন্মগত ব্যামো।

নানির কাছে এ গল্প শোনার পর থেকে কৈশোর বয়সেই সবার অগোচরে অনেকবার চেটে-চেটে মধু খেয়েছি— মধুভাষী হতে চেয়েছি। শেষে অনেকবার আঙুলে করে ঠোঁটে মধুর প্রলেপ দিয়েছি, কিন্তু কোনো কাজ হয়েছে বলে আজও মনে হয় না।

মা বেঁচে থাকলে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করতাম, 'মা, তুমি বিষ বোতলে ভরে ছিপি দিয়ে না রেখে, সিলভারের হালকা গ্লাসে ঢেলে রেখেছিলে কেন? আমার যে সেই কৈশোর থেকে আজ পর্যন্ত মৃত্যুভয়, এতো অকালমৃত্যুর স্তূপাকার লাশ, স্তূপের উপরে স্তূপ দেখতে যে আর ভালো লাগে না। আমার যে আর দুশ্চিন্তা করতে ভালো লাগে না! আমি যে বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেছি! তুমি কেন ঐ ভুলটা করেছিলে? স্বাধীনতার নামে তোমরা আমাকে আকৈশোর এ কী ছটফটানি-যন্ত্রণা দিলে!'

প্রতিদিন পত্রিকা পড়া মানেই লাশের খবর নেয়া। প্রতিদিন অবিরাম আত্মপ্রবঞ্চনা। জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব চাওয়া-পাওয়া, সুখ-শান্তি লাশের স্তূপে চাপা পড়ে গেছে। এখন জীবনময় শুধু লাশ আর লাশ, অস্বাভাবিক মৃত্যু, ক্রসফায়ার আর গুম। লাশকে নিয়েই হাসি-কাঁদি, লাশকে নিয়ে উপার্জনের সমীকরণ মিলাই, আবার পরের দিন সকাল পর্যন্ত লাশের খবর পড়ার জন্য অপেক্ষায় থাকি।

স্বাধীনতার চার দশক পরও আজ সেলিম ভাইয়ের মতো হাজার হাজার সেলিম ভাই, চেনা-অচেনা দলীয় বাহিনীর খুন-গুমের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ অগোচরে পৃথিবী থেকে সেলিম ভাইয়ের মতো নিশ্চিহ্ন ও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আমিও শঙ্কামুক্ত নই। ওদের চাওয়া তেমন বড় কিছু না। ওরা আছে আত্মপ্রবঞ্চনামুক্ত নিরপেক্ষ বিচারালয়ে পৌঁছানোর অপেক্ষায়। শুনেছি, এটা না কি ওদের সাংবিধানিক অধিকার।

তেরো

পরদিন আবার নিয়মিত অফিসে যাবার পালা। বাসা থেকে অফিস তেরো-চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে। এই দূরত্বে যেতে বড়জোর আধাঘণ্টা সময় লাগার কথা— লাগে কমপক্ষে দু ঘণ্টা। আরো আধা ঘণ্টা অতিরিক্ত হাতে নিয়ে বেরোতে হয়। কখনো তিন ঘণ্টাও লাগে। আবার কখনো আধাবেলা পথে অপেক্ষা করে বাসায় ফিরে আসতে হয়। এ এক আজব শহর। অনেক ক্ষেত্রে যানবাহনের চেয়ে পায়ে হেঁটে আগে পৌঁছানো যায়। কিন্তু তেরো-চৌদ্দ কিলোমিটার পথ কি আর প্রতিদিন হেঁটে যাতায়াত করা যায়? তাই বাসে ওঠা।

আসলে বাসের ভিতর পর্যন্ত উঠিনে, ওঠার দরকারও হয় না— দরজা পর্যন্ত উঠি। তারপর বাসের পিছন পর্যন্ত কন্ডাকটর তার পিছন দিয়ে ঠেলে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যায়। একদিকে কাত হয়ে শক্ত হাতে মাথার উপরে বাঁধা রড ধরে তাল রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পুরো বাসটাতে আটার বস্তার মতো করে থরে থরে যাত্রী সাজায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামনের গাড়ি চলে না— ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। পিছনে আরো অসংখ্য গাড়ির অপেক্ষা দেখি। সে সাথে অফিসে পৌঁছানোর অপেক্ষা। প্রতিদিন অফিসে আসা-যাওয়ার পথে এ এক নিয়মিত প্রাকটিস।

সামনে তাকিয়ে যতদূর চোখ যায়— শুধু যান আর যান। তারপর আর চোখ যায় না। সামনে কী হচ্ছে, জানিনে। পথের উপরে কি কোনো খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছে, আনন্দ মিছিল হচ্ছে, কোনো মহান নেতার দাফন হচ্ছে? জানিনে। কখনো পাঁচ-দশ হাত করে সামনে এগোয়, কখনো পঞ্চাশ গজ, আবার থামে।

প্রতিদিন সাত ঘণ্টা করে অফিসে সময় দেয়া লাগে। অফিসে যাওয়া-আসার পথে সময় দিতে হয় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা। এ সময়টাতে রাস্তায় বসে থেকে অসহ্য কালো ধোঁয়ার মধ্যে, গরমে দুর্বিষহ হয়ে প্রতিদিন যারপরনাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এভাবে

ক্রমশ জীবনীশক্তি নষ্ট করে ফেলছি। কম বয়সে এ পরিশ্রম ও কালো ধোঁয়া হজম করেছি। অকালেই জীবন শেষ হয়ে গেছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীর আর পারে না, এখন ক্রমশই নেতিয়ে পড়ছি। মনে হয়, একটা প্রতারকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় অন্য আরেকটা অপ্রশিক্ষিত পেশাদার গোষ্ঠীর কারণে এ দেশের একটা কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনীশক্তি রাজপথে প্রতিদিন তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, দেখার কেউ নেই, ভাবারও কেউ নেই।

মাটি খুঁড়ে বের করে আনা সীমিত প্রাকৃতিক গ্যাস, আমদানি করা দামি পেট্রোল, সব ধোঁয়া হয়ে প্রতিদিন আকাশের অসীমে উড়ে যাচ্ছে। আধা ঘণ্টার পথ যদি একটু একটু করে তিন ঘণ্টায় পেরোতে হয়, স্বাভাবিক নিয়মের তুলনায় তেল-গ্যাস ছয় গুণ বেশি পোড়ে। লক্ষ লক্ষ যানবাহনে ভরা এ প্রাকৃতিক সম্পদের আর্থিক মূল্য প্রতিদিন কত কোটি টাকা? কে এতো খোঁজ রাখে! এসব ভাবতে গেলে মাথাটা বিগড়ে যাবার উপক্রম হয়। এ দেশে বাস করতে হয়, তাই ভাবিনে।

কখনো সিট থেকে একজন উঠে গেলে সুযোগমতো সিটে বসি। পাশে কারো কাছ থেকে দৈনিক পত্রিকা নিয়ে চোখ রাখি। সেই খুন-খারাবির খবর আর পড়তে ভালো লাগে না, তাই অন্য খবর পড়ি। তাও শেষ হয়ে যায়, পথ শেষ হয় না। শেষে পত্রিকাটা আলতোভাবে নাড়াচাড়া করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন প্রতিদিন একবার কমনরুমে গিয়ে দৈনিক পত্রিকাগুলো পড়তাম। আমার এক বন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনটা প্রতিদিন দেখার বদ-খসলত হোক, বা বদ-নেশাই হোক, তৈরি করে দিয়েছিল। বিজ্ঞাপনগুলো পড়তে বেশ ভালোই লাগতো। মজা পেতাম– নেশা ধরে গিয়েছিল।

বাসে বসে সব পড়া শেষে এখনো অগত্যা সে নেশার চর্চা করি। মনটা ভালো লাগে। লাশের ছবি সাময়িকভাবে ভুলে থাকতে পারি। একটা জিনিস লক্ষ করি, নিজেকে আজও 'পাত্র' ভাবতে খুব ভালো লাগে। যদিও জীবনের সব ভাবনা ও ভালো লাগার কথা প্রকাশ করা যায় না।

আনমনে ভাবি– আচ্ছা, সুদূরী কি কখনো 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন দেবে? সুদূরীর স্বামী তো একজন ব্যবসায়ী-রাজনীতিক। এ দেশে তো কত রাজনীতির

ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ী-রাজনীতিক রাজনীতি-অস্ত্র-অর্থ– এই ত্রি-চলক সমীকরণের বেঘোরে পড়ে প্রতিনিয়ত জীবনের সমাপ্তি টানছে। কত ওঝাই তো পোষা সাপের ছোবলে ভূপাতিত হচ্ছে। যদি এমন হয়, সুদূরী কি তখন 'ধনাঢ্য বিধবা মহিলার জন্য নির্ঝঞ্ঝাট ষাটোর্ধ মুক্তমনা পাত্র চাই' বলে বিজ্ঞাপন দেবে? একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। আবার সামনের দিকে তাকাই, অফিসে পৌঁছানোর অপেক্ষা করি।

ভাবি, প্রতিদিন এভাবে কত লক্ষ লক্ষ লোকের কোটি কোটি শ্রমঘণ্টা যে অলসভাবে পথে বসে থেকে নষ্ট হচ্ছে, এ নিয়ে কারো কি কোনো মাথাব্যথা আছে? এ দেশে কি এসব ভেবে দেখার লোক আছে? পারিষদ অমাত্যবর্গ তো দলবাজি, মারামারি, গলাবাজি, গুলি চালাচালিতে পাকা হাত। তাদের মাথায় তো এ ভাবনা ও সমাধানের পথ আসার কথা নয়। বড়জোর প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংকের ঋণকৃত অর্থায়নে সাদা চামড়ার কয়েকজন বিদেশী কলসালট্যান্ট আনা যায়। তারা এসে বাঙালি জাতির সামাজিক বুনন, মন-মানসিকতার মতো মূল সমস্যা বুঝবে কী করে? তারা হয়তো উপদেশ দেবে, রাস্তা বড় করো, উড়াল সেতু করো, পাতাল দিয়ে চলো, জমি অল্প হলে কী হবে– পুরোটাই রাস্তা বানিয়ে দাও, ব্যস। এখানেই কনসালট্যান্সি ফি শেষ।

বাসে বসে থাকতে থাকতে বড্ড ধন্ধে জড়িয়ে যাই। রাগের মাথায় উচিত কথা বলে ফেলি। জীবনের ঝুঁকি তৈরি হয়ে যায়। শেষে সেলিম ভাইয়ের মতো অবস্থা হবার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

যানজটের এ সমস্যা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, পত্রিকায় প্রতিনিয়ত লেখালেখি হয়। কিন্তু 'যাহা পূর্বং, তাহাই পরং'। এমন কী, একবার তো দেশের ঘড়ির কাঁটা এগারোটা থেকে ঘুরিয়ে দেশের বারোটা বাজানোর চর্চাও হয়েছে। কোনো ফলোদয় হয়নি। এখন দেশের উন্নয়নের হাইওয়েতে মন চলে গেছে। সরুপথ, গলিপথ দৃষ্টির অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে।

আমিও বাসে বসে পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি শেষে নিরুপায় হয়ে রাস্তার দু পাশে টাঙানো উন্নয়নের রং-বেরংয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনগুলো দেখি। রাজনৈতিক

বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি— বড় বড় জাতীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনকেও হার মানিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বাস থেকে নেমে সামনে হাঁটা ধরি। বেশ কিছুদূর যাবার পর দেখি, কোনো এক রাস্তার মোড়ে— ঠিক বাঁক ঘোরার জায়গায়, কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে যাত্রী উঠানামা করাচ্ছে। যাত্রীরাও বাস স্টপেজ ছেড়ে মোড়ে এসে ভিড় করেছে, প্রতিটা বাস যদি এক মিনিট করেও মোড়ে দাঁড়ায়, পিছনের শত শত যানবাহন কত মিনিটের লাইনে পড়ে, এটা বুঝতে চায় না।

এখন কোথাও যানজটে পড়লেই সেখান থেকে হাঁটা ধরি। সামনের সমস্যাটা কী, দেখার চেষ্টা করি। যানজটের উৎসস্থলে চলে যাই। প্রতিদিন দেখতে দেখতে মাথার মধ্যে একটা 'ডাটা বেজ' তৈরি হয়ে গেছে। অধিকাংশ যানজটের উৎসের একটা সুদীর্ঘ 'ডকুমেন্টারি ফিল্ম' মাথার মধ্যে নিয়ত ঘুরছে। অবসর সময়ে একটু চোখ বুজলেই তার চলন্ত ছবি দেখা যায়, বিশ্লেষণ করা যায়। আপনা আপনি সমাধান বেরিয়ে আসে। কমপক্ষে 'প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট' পাস যে কোনো বোধসম্পন্ন বাঙালিই এ ফিল্ম দেখলে সমস্যাগুলো খুঁজে বের করতে পারেন।

কোথাও দেখি, গাড়ি যাবে ডানের রাস্তায়, অথচ ঠিক মোড়টাতে বাসের বাম লেন বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোনোদিকেই গাড়ি যেতে পারছে না— পিছনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, লাইন ক্রমশই বাড়ছে। বলারও কেউ নেই, করারও কেউ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে।

তেমাথা কিংবা চৌরাস্তার মোড়ে— মোড়টা পেরিয়েই বাসগুলো থেমে যায়, বাস স্টপেজ পর্যন্ত যায় না, যাত্রী উঠানো-নামানো শুরু হয়ে যায়। পিছনের যানগুলো আর পার হতে পারে না। একবার সিগন্যাল পেলে যেখানে কমপক্ষে ষাট-সত্তরটা গাড়ি পার হবার কথা, পার হতে পারে মাত্র দশ-বারোটা গাড়ি। অবশিষ্ট গাড়িগুলো পার না হতে পেরে সিগন্যালে জমতে থাকে। পিছনে এসে আরো গাড়ি কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে যায়। পরবর্তী সিগন্যাল আসতে আসতে গাড়ি ক্রমশই বাড়ে। সিগন্যাল পেলে আবার বারো থেকে পনেরোটা গাড়ি পার হয়। সময় পেরিয়ে যায়,

গাড়ির সংখ্যা বাড়ে। নাম যানজট। সিগন্যালের আগেও যানজট, পরেও যানজট। কোনো তেমাথা কিংবা চৌমাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মোশান-স্টাডি করলেই যে কারো চোখেই সমস্যাটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

আমরা সবসময় যানের মডেলের দিকে তাকাই— পুরোনা, না নতুন, এটা দেখি। ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তির দিকে, তার সুশিক্ষার দিকে, মানসিক অবস্থার দিকে, স্বভাবের দিকে তাকাইনে। ওখানে যারা বসে আছে, তার মানসিক পর্যায় কেমন, তাদের মানসিকতার উন্নয়নের জন্য কী কী করা দরকার, ভাবিনে। গাড়ি চালকদের গুরু, তথা রাজনৈতিক চালকদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনা যায় কিনা, তাও ভাবিনে। শুধু উড়াল সেতু দিয়ে উড়তে চাই, পাতাল ফুঁড়ে চলতে চাই। সেজন্য দশ-পনেরো-বিশ বছর ধরে অপেক্ষা করতে চাই। আকাশ-পাতাল চলাচল তৈরির নামে বছরের পর বছর জনদুর্ভোগ পোহাতে চাই। সহজে সমাধানযোগ্য নিজেদের স্বভাবের সামান্য একটু পরিবর্তনও করতে চাইনে।

বাসগুলো যাত্রী নেয়ার অপেক্ষায় প্রতিটি স্টপেজে— এমনকি প্রতিটি গলির মাথায়, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা বাস, অন্য আরেকটা বাসকে কোনোক্রমেই আগে যেতে দেয় না। কখনো মাঝ রাস্তায় একটা বাসের আগে আরেকটা বাস পাছা ঘুরিয়ে দিয়ে, আড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— যাত্রী ওঠায়, নামায়; রড খালি, সিট খালি বলে চিৎকার করে। নিজেও যায় না, অন্যকেও যেতে দেয় না। এভাবে দু-তিন মিনিট দাঁড়ালেই পিছনে কমপক্ষে পঞ্চাশটা যানের লাইন পড়ে যায়। পিক আওয়ার হলে আরো বেশি। সেগুলো পিছন থেকে ভেঁপু বাজাতে থাকে, পিছনে যানের সংখ্যা আরো বাড়ে। প্রতিটা স্টপেজে দুই-তিন লেনের যান এক লেন দিয়ে ধীরে ধীরে পার হয়, কখনো যেতে না-পেরে ভেঁপু বাজায়। পাঁচ শ গজ থেকে সাত শ গজ পর পর বাস স্টপেজ। চলতি পথে যতগুলো বাস স্টপেজ তত জায়গায় যানজট। পিছনে যানের সারি— নাম যানজট। বাস থেকে হেঁটে একটু সামনে এগুলে দেখা যায়— এ জটের কোনো হেতু নেই, সামনে ফাঁকা রাস্তা পড়ে আছে, এ জট মানসিক বিকলতার জট, অশিক্ষা-কুশিক্ষার জট। ইচ্ছে করে পথ বন্ধ রাখায় জট। নিয়ম না-মানার জট। দেশের সার্বিক অবস্থার প্রতিফলন।

রাস্তায় দেখি, অনেকেই ট্রাফিক নিয়মের কোনো তোয়াক্কা করে না। লালবাতি জ্বলছে, তবু গাড়ি চলছে। কেউ এসে থামিয়ে না দেয়া পর্যন্ত চলছে। ক্রসিংয়ে দুই রাস্তার যান একই সাথে যাওয়া শুরু করে। 'মুনা যায় উজান, তো ধুনা যায় ভাটি।' যেতে পারবে কিনা বুঝেও বোঝে না, সুযোগ পেলেই নাক গুঁজে দেয়। শেষে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। এভাবে দু মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে দু দিকেই দীর্ঘ যানজট। এক মিনিটের তর সয় না, যানজট বাঁধিয়ে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। আইল্যান্ড না থাকা রাস্তাগুলোতে তো মাঝে মাঝে পুরো রাস্তা জুড়েই দুদিকে সামনাসামনি। সবারই ওভারটেক করে নিজে আগে যাবার চেষ্টা। নিয়ম মানার বালাই নেই, পরে এসে আগে যাওয়ার চেষ্টায় বিবেকের কোনো দংশন নেই– কাণ্ডজ্ঞানহীন চেষ্টা। শেষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা।

অনেক প্রধান সড়কের উপরেই গাড়ি পার্কিং করা থাকে– কখনো এক সারিতে, কখনো দুই সারিতে। গাড়ি যাতায়াতের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে ট্রাফিক জ্যাম। প্রাইভেট কারে চড়ে আসা সাহেব-সাহেবানরা গন্তব্য স্থান থেকে দূরে কোথাও গাড়ি পার্কিংয়ে অভ্যস্ত নন। যে স্কুলে ছেলেমেয়ে পড়ছে, গাড়ি থেকে পা-টা নামিয়ে ঠিক স্কুলের বারান্দায় রাখতে চান। ফলস্বরূপ যানজট।

রাজধানীতে রিক্সা আরেকটা সমস্যা। রিক্সাওয়ালা রিক্সার প্যাডেল ঘুরিয়ে হ্যান্ডেল ধরে শুধু সামনে এগোতেই জানে। রাস্তার কোনো নিয়ম-কানুন জানে না, মানে না– বোঝেও না, বুঝতে চায়ও না। সাধারণ কোনো জ্ঞানও নেই, কোনো বোধশক্তিও নেই। 'চলা ছাড়া জানে না সে অন্য কিছু আর।' দ্রুতগতির যানের মধ্যে ধীরগতির যান। একটু সুযোগ পেলেই চোখের পলকে হ্যান্ডেল বাঁকিয়ে দু গাড়ির ফাঁকে ঢুকিয়ে দেবে। প্যাডেলে চরণ, মানে না বারণ। নিজেও যেতে পারে না, অন্যকেও যেতে দেয় না।

ওদের কর্মকাণ্ড দেখলে মাঝেমধ্যে খুব রাগ হয়, মাথা ঠান্ডা রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দ্রুতগামী গাড়ির সামনে হঠাৎ রিক্সাটা ঠেলে দেয়। জীবনহানি ঘটায়। নিজেও মরে, অন্যকেও মারে। ঘর্মাক্ত শরীর ও কর্মক্লান্ত অপুষ্ট মুখের দিকে একবার তাকালেই রাগটা পড়ে যায়, মনে মমতা আসে। ভাবি, ওদের এ অবস্থার

জন্য তো আমরাই দায়ী, আমরাই তো ওদেরকে শুষে খেয়ে এ অবস্থায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

রাজনৈতিক উৎসবের দিন হলে তো কোনো কথাই নেই। দেশের জন্য রাজনীতি না— রাজনীতির জন্য দেশ। আজ আবার যাওয়া-আসা কেন?— শুধু যানজটে বসে সময়মতো হাততালি দেয়ার অপেক্ষা, আনন্দ উল্লাসের দিন। রাজনৈতিক জোয়ারে দেশ ভাসে।

ধরা যাক, বড়কর্তা এয়ারপোর্ট হয়ে বড় পতাকা উড়িয়ে দেশে ফিরবেন। আজ শুধু আনন্দের দিন। আজ আর দেশে কোনো কাজ-কাম করার প্রয়োজন নেই। আগমনের প্রধান সড়ক আজ বন্ধ। সড়কের দু পাশ ঘিরে 'চাটার দল', ভাড়াটের দল, উৎসাহ দেখানোর জন্য সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। চাকরি বাঁচাতে ট্রাফিক পুলিশ তিন-চার ঘণ্টা আগ থেকেই ট্রাফিক চলাচল বন্ধ করে দেয়। প্রতিটা রাস্তায়, অলিতে-গলিতে এর প্রভাব পড়ে। সারাদিন আর ট্রাফিক চলাচল স্বাভাবিক হয় না। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ হলেও একই অবস্থা। ভোগান্তিটা সাধারণ মানুষের। দিনটা পার হয়ে গেলেই ভোগান্তিও চাপা পড়ে যায়।

বড়কর্তা প্রায়ই পতাকা উড়িয়ে কোনো কিছু উদ্বোধন করতে কোথাও যান, বলা নেই, কওয়া নেই এক বা একাধিক রাস্তায় হঠাৎ ট্রাফিক চলাচল বন্ধ। অন্য সব লোকের ঐ দিনের সমস্ত কাজ বাতিল হয়। ভোগান্তির সীমা-পরিসীমা থাকে না। দিনটা পার হয়ে গেলেই ভুক্তভোগীরা সব ভুলে যায়। আমরা সহজেই খুব তাড়াতাড়ি অতীত ভুলে যাই। অতীত ভোলার গৌরব আমাদের আছে।

একটা ঘটনার স্মৃতিচারণ করি। ক বছর আগের কথা। রোজার দিন। কী মনে করে যেন অফিসের গাড়িতে উঠেছি। আমরা দশ-বারো জন মাইক্রোবাসের যাত্রী। আমাদের অযোগ্যতা এটুকু যে, সেদিন বড়কর্তার বাসভবনে যে 'ইফতার পার্টির' আয়োজন করা হয়েছে তা না জানা। আমরা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে যাব। এক ঘণ্টা আগ থেকেই এ রাস্তার যানগুলো অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়েছে। কেন রাখা হয়েছে, তা জানিনে। আমাদের গাড়িটা অপেক্ষারত গাড়ির লাইনে শরিক হলো। কতক্ষণ এভাবে রাখা হবে, তাও জানিনে। পুব-পশ্চিমের রাস্তাটা খোলা। সাঁই-

সাঁই করে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধু আমরা গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে বসে আছি তো আছিই। অবশেষে ইফতারের আট-দশ মিনিট আগে এ দিকের গাড়িগুলো ছাড়লো। এত ভিড়ের মধ্যে গাড়িটা ক্রসিং পেরোতেই আজান দিয়ে দিল। ঐ দিন আমাদের সবারই থুথু গিলে ইফতার করতে হয়েছিল।

বড়কর্তা ধরে আনতে বললে পাইক-পেয়াদারা বেঁধে আনে, এটা আমিও বুঝি। এ প্রবাদ সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। সেজন্য বোধশক্তিসম্পন্ন বড় কর্তাদেরও এ প্রবাদটা মনে রাখা দরকার এবং বাস্তবতা সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। 'আমি তো কিছু জানিনে, আমি তো এভাবে বলিনি, ওরা এটা করেছে।'—এ ধরনের এড়িয়ে যাওয়া, দায়সারা গোছের উত্তর কোনো দক্ষ প্রশাসকের উত্তর নয়। কোন সুইচে টিপ দিলে কোন ফ্যানটা ঘুরবে এবং ঘোরার পরিণতিই-বা কী হবে, তা যদি প্রশাসকের মনে ভেসে না ওঠে— তাঁকে দূরদর্শী ও সৃজনশীল প্রশাসক বলা যায় না। 'রাম নাম যদি হয়, সেটা আমার, আর শ্রাদ্ধ যত সব তোমার' —এ মনোভাব যারপরনাই ঘৃণ্য।

বাস-ট্রাকের চালকরা ট্রাফিক পুলিশের কোনো কথাকে পাত্তাই দেয় না। সুযোগ পেলেই ট্রাকের ড্রাইভাররা ট্রাফিক পুলিশ বা সার্জেন্টকে ট্রাকচাপা দিয়ে পালায়। বাস-ট্রাকের মালিক সমিতি মাসোহারার মাধ্যমে ট্রাফিক পুলিশ বিভাগকে অনুগত করেছে। বাসস্ট্যান্ডের আঞ্চলিক রাজনীতিবিদদেরও কিনেছে। রাস্তায় কারো কোনো নিয়ম মেনে চলার দরকার হয় না। এসব দেখে ট্রাফিক কর্তৃপক্ষও অধিকাংশ রাস্তা থেকে লেন-বিভাজন রেখা উঠিয়ে নিয়েছে। যা কেউ মানে না, তা করার জন্য টাকা খরচের দরকার কী! রাস্তায় সকল অনিয়মের জট, তাই যানজট।

আমি বুঝি, কিন্তু একটু দেরিতে বুঝি। এজন্য একবার আমার এক সহকর্মী বন্ধুর কাছ থেকে ধমক শুনতে হয়েছিল। আমার এক সাবেক সহকর্মীর হার্ট এটাক করেছে। ভর্তি হয়েছে ফরিদপুর হাসপাতালে। পরদিন ফরিদপুরের হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলাম। পথে ভিড়। পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল। ঐ দিন ঢাকায় আমাকে ফিরতেই হবে। ফরিদপুর শহর থেকে দু-তিন কিলোমিটার দূরে মাগুরা-রাজবাড়ী রাস্তার ফরিদপুর মোড়ে এলাম। সন্ধ্যা লেগে গেছে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি

পড়ছে। একটা টোঙ দোকানের ঝাঁপের নীচে দাঁড়িয়ে আছি। পথচলতি বাসের অপেক্ষা করছি।

রাস্তার মোড়ে— রোড ডিভাইডারের উপর একজন ট্রাফিক পুলিশ ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। হাতে টর্চ লাইট। বাস-ট্রাক আসা দেখলেই দূর থেকে টর্চ জ্বেলে সেদিকে ধরছে। বাস-ট্রাক এসে তার কাছে থামছে। হ্যান্ডশেক করছে, চলে যাচ্ছে। ড্রাইভারদের সাথে ট্রাফিক-পুলিশের এ হৃদ্যতা আমার খুব ভালো লাগলো। ভাবলাম, এবার পজিটিভ সম্পর্ক এসেছে। দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি সুনিশ্চিত। পরদিন অফিসে গেছি। সহকর্মী-বন্ধুদের সাথে গল্পে মেতেছি। গল্পের এক ফাঁকে বললাম, 'তোমরা তো শুধু সব কিছুর খারাপ দিকটাই দেখো। গতকাল সন্ধ্যায় ফরিদপুর মোড়ে এক ট্রাফিক পুলিশকে দেখলাম প্রতিটা বাস-ট্রাক ড্রাইভারের সাথে করমর্দন করছে। কী মানিকজোড় সম্পর্কই না ওদের মধ্যে! তোমরা যে বল, ড্রাইভাররা সুযোগ পেলেই ট্রাফিক পুলিশ-সার্জেন্টকে চাপা দেয়!' এক সহকর্মী-বন্ধু জোরে এক ধমক দিয়ে বললো, 'দূর, রামছাগল কোথাকার! করমর্দনের মর্মকথা কি তুই বুঝিস? টর্চ জ্বালানো মানেই 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখানকার পাওনাটা দিয়ে যা। প্রতিটা পথের মোড়ে মোড়েই পাওনার রেট পূর্বনির্ধারিত আছে। করমর্দন করলেই হাতে চলে আসে।'

তার ধমকে আমি হতচকিত হলাম। চৈতন্যোদয় হলো। সহজ সমীকরণ বুঝলাম, কিন্তু একদিন পরে।

যানজট বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি। মাথার মধ্যে রেকর্ড-হয়ে-যাওয়া 'ডকুমেন্টারি ফিল্ম'গুলো অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। প্রধান রাস্তাগুলো থেকে যদি ধীরগতির যান, যেমন— রিক্সা উঠিয়ে দেয়া যায় এবং গাড়ির চালক ও চালকদের-চালকগোষ্ঠীর মানসিকতার পরিবর্তন আনা যায় তাহলেই শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ যানজট নিশ্চিত দূর হয়। অলিগলিতে কিংবা বড় রাস্তার পাশ দিয়ে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করার ফলে এ শহরে বাস করা অসংখ্য মানুষের ডায়াবেটিস ও ব্লাডপ্রেসারের রোগ অনেকটা কমে আসে। এ যানজট

অনিয়মের জট, মনের জট, অশিক্ষার জট, বিকৃত মানসিকতার জট, অভ্যাসের জট— এটা আগে মানি, এ জট আগে দূর হোক। অতঃপর তিনতলা-পাঁচতলা উড়াল-সড়ক, পাতাল-সড়ক হোক, বিশ-পঞ্চাশ-এক শ বছর সময় লাগুক— কোনোই আপত্তি নেই। নইলে আকাশেও যানজট হবে, পাতালেও যানজট হবে— এ থেকে রক্ষা নেই।

এর মধ্যে দেখলাম, রাস্তার যানজট এড়ানোর একটা বিকল্প পথও বেরিয়েছে— বেশ ক বছর ধরেই দেখছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলোকে উল্টোপথ দিয়ে যেতে। ভাবলাম, যাক! কৃতী সন্তানদের কর্ম, সবই ভালো। কিছুদিন পর দেখি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসও উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, 'দেখাদেখি চাষ, দেখাদেখি বাস'। কয়েক দিন আগে দেখলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসও উল্টো পথ ধরেছে। ভালই লাগলো। সতীর্থ অনুসরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িগুলোর পিছ পিছ অন্য কিছু গাড়িও যেতে দেখি। এভাবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসই একসময় যাবে। তাছাড়া, নেতা-নেত্রী, কর্মী, পোষ্যপুত্র-তস্যপুত্রদের গাড়িও এভাবেই একদিন যাবে। আমরা শুধু ঘণ্টাব্যাপী যানজটে বসে তা দেখার অপেক্ষা।

বর্তমানে যোগ্য সন্তানরা আর আমজনতার সমস্যা সমাধানে ব্রতী নয়। নিজ নিজ সমস্যা নিজে নিজে বিকল্প পথে সমাধান করছে। অতীতে দেশের কোনো সমস্যা সমাধানে, দেশের উন্নয়নে, স্বাধীনতা যুদ্ধে উচ্চশিক্ষারত ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজই একমাত্র ভরসা ছিল। বর্তমানে সে গুড়ে বালি। ছাত্র ও যুবসমাজ আর কোনোদিন কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদী হবে কিনা ঘোর সন্দেহ। মেধাবীরা যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে উন্নত দেশে বসতি গড়া যায়, সে চেষ্টায় ব্যস্ত। অর্ধ-মেধাবীরা অধিকাংশই চরিত্র হারিয়ে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে সুবিধা লোটায় নিয়োজিত। বড় একটা অংশ বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত, বিপর্যস্ত। তাদের কাছে 'অন্ন চিন্তা চমৎকার'। এরা মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা মালয়েশিয়ার মতো দেশে শ্রম বিক্রি করার ধান্ধায় ব্যস্ত। বাকি অথর্ব অংশ কম্পিউটার-মোবাইল ফোনের অপব্যবহারে

আসক্ত, খেলা দেখায় মত্ত। রাত আসে, দিন যায়। কীভাবে আসে, কেন যায়, কোথায় যায়, ভাবে না। এভাবেই দিন কেটে যায়। তারা একটাই ভাবে, গোলেমালে কেটে যাবে দিন।

সমাজ পরিবর্তনশীল। সময়ের ধারায় নিত্যনতুন টেকনোলজি আবিষ্কারে সমাজের পরিবর্তন আসতেই থাকবে। জীবন বহমান নদীর মতো। জীবন সামাজিক এ পরিবর্তন মেনে নেবে। পরিবর্তনটা কোনদিকে হচ্ছে এটা ভাবার বিষয়। রাষ্ট্র-পরিচালকরা তাদের কর্ম ও পলিসি তৈরির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে পরিবর্তনের পজিটিভ ধারার সাথে মিলিয়ে দেবে, যাতে সমাজ ও জাতীয় জীবন উন্নতির দিকে এগোয়। এখানেই রাষ্ট্র-পরিচালকদের সার্থকতা, জাতির উন্নতি। পরিবর্তনটাকে যদি নেগেটিভ দিকে ঠেলে দেয়া হয়, তাতে জাতির দুর্গতি–বর্তমান ও ভবিষ্যতে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস হতে বাধ্য, যা জাতির ললাটে অধঃপতনের তিলক এঁকে দেয়ার শামিল। পরিণতিতে অন্য কোনো জাতির গোলামি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রাষ্ট্রপরিচালকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রকৃতির প্রতিশোধ বড় নির্মম। একজনের ভুলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ভুগতে হয়। চোখের সামনের অতি ক্ষুদ্র বুড়ো আঙুল দূরের বিশাল হিমালয়কেও ঢেকে দেয়। সমাজ জাগরণের নেতারা এখন ভুলের যে ছোট্ট বীজ বপন করে যাবেন, তা একদিন মহীরুহ আকার ধারণ করবে। ইতিহাস বলে, ভুলের কারণে অনেক জাতি বিশ্বের মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের বোঝা দরকার, ‘কতটুকু ভুল আর কতটুকু সত্যি, কতটুকু বল আর কতটুকু বল না, নিজেই বোঝো কি তুমি? কোনটা তোমার ভুল আর কোনটা ছলনা।’ আমরা তা বোঝা ও দেখার অপেক্ষায়।

চৌদ্দ

গত বছরের শেষের দিকে একটা ফোন কল পেলাম। অজানা নম্বর। সালাম দিয়ে বললো— আমাকে চিনতে পারবেন না, চাচা। আমি আপনাদের পাশের গ্রামের লাঠি খেলোয়াড় আজগর আলীর ছেলে। আমি ছোটবেলায় আপনাকে দেখেছি। আমার দুই মেয়ে, এক ছেলে, চাচা। মেয়ে দুটোরই বিয়ে হয়ে গেছে, এক ছেলে নিয়ে এখন খুব বিপদে পড়ে গেছি, চাচা। অনেক চেষ্টা করে আপনার ফোন নম্বরটা জোগাড় করেছি। আমার ছেলেটা আট মাস ধরে ঢাকার ঐ এক হাসপাতালে চিকিৎসায় রয়েছে। আমার সহায় সম্বল সব শেষ হয়ে গেছে। চাচা, আপনার কাছে কিছু সাহায্য চাচ্ছি। যদি আপনি দেন, আমার এই বিপদে খুব উপকার হবে, চাচা। আপনি আমাকে না চিনলেও আমরা সবাই আপনার নাম শুনেছি। আমি আপনার সাথে একটু দেখা করতে চাই, চাচা।

আমি তো গ্রামের ঝোপঝাড়ে ঘেরা পরিবেশে কাদা-মাটি মাখা গরুর রাখাল। এখন শহরে এসে শহুরে সাহেব হয়ে গেছি। তাও শুধু সাহেব নয়— মাস্টারসাহেব। অনেক বছর পর আজগর ভাইয়ের নামটা শুনে মনটা খুব নরম হয়ে গেল। ভাবাবেগে তাড়িত হলাম। সাহেদ মাস্টার ঢাকায় এলে অনেকের সাথে আজগর ভাইয়ের খোঁজখবরও নিতাম। তাও অনেক বছর হয়ে গেছে।

আজগর ভাই বয়সে আমার অনেক বড়। মুক্ত মনের আমুদে মানুষ। গ্রামের খাঁটি সহজ-সরল রঙিন মনের মানুষ। যুবক বয়সে তাঁকে রঙিন হাফ-প্যান্ট পরে লাঠিখেলা করতে দেখেছি। যুদ্ধের সময় ঐ লাঠি নিয়ে খানসেনা মারার পাঁয়তারা করতেন। যুদ্ধের আগে এলাকার নেতাদের সাথে বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে যেতেন। নেতাদের পিছ পিছ ঘুরতেন। সংসারের কাজ ফেলে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রামের রংয়ে রং মেলাতেন। বিজয়ের দিন সে কী আনন্দ! গ্রামের ত্রিমোহনীতে লাঠি খেলার আয়োজন করলেন।

দেশ মুক্ত হলে গম, চাল, গুঁড়োদুধ ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের সাথে রিলিফ হিসেবে কম্বল, শার্টপিস, লুঙি আসতো। কত এসেছে সে হিসাব তিনি কোনোদিনই জানতেন না, নিতেনও না। শার্টপিস, লুঙি বণ্টনে এক পিস পেলেই খুশিতে বাগবাগ। নেতাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হলো কী না সেদিকে খেয়াল নেই।

অনেক বছর হলো রোগে ভুগে ভুগে জীবন থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। ছেলেগুলো সব দিনমজুর। বসত ভিটে কারো আছে, কারো নেই। মেয়ে দুটো দিনমজুরদের সাথে বিয়ে হয়ে গ্রাম ছেড়েছে। এক ছেলে ভিটে বিক্রি করে বিদেশ যাবার জন্য এক আদম ব্যাপারিকে টাকা দিয়েছিল। বিদেশে যেতে পারেনি, টাকাও আর ফেরত পায়নি। আদম ব্যাপারি আবার রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক। এখন টাকা ফেরত দেয়ার জন্য আদম ব্যাপারিকে চাপ দিলে, সেও পাল্টা হুমকি দেয়। শেষে ভিটেহারা হয়ে অন্যের জমিতে বসবাস। আবার সেই কাঁচি-মাথাল সম্বল। দিন আনা, দিন খাওয়া।

আজগর ভাইয়ের সাথে আমার যে কত সখ্য ছিল, তাঁর এ ছেলের হয়তো জানা নেই। নামটা উচ্চারণ করতেই মনের কোণে অনেক না-বলা স্মৃতি উঁকি দিয়ে গেল। আজগর ভাই একবার আমাকে কিছু তালের শাখার আঁশ ও বাঁশের শলা দিয়েছিলেন— মাছ ধরার যন্ত্র তৈরি করার জন্য। আমি তার কাছে আজগর ভাই সম্বন্ধে কিছুই বললাম না। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এখন কোথায়? ছেলের কী হয়েছে?'

'ছেলের দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি গ্রাম থেকে কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে বাড়িতে এসেছি। আগামী সপ্তায় ঢাকা যাব'— সে বললো। আমি তাকে ঢাকায় এসে আমাকে একটা ফোন দিতে বললাম।

গত সপ্তায় আবার তার ফোন পেলাম। সে ঢাকায় এসেছে। আমাকে ছেলেটাকে দেখে আসতে অনুরোধ করলো। আমি পরের দিন বিকেলে আসবো বলে কথা দিলাম। পরদিন বিকেলে সে আবার ফোন দিল। আমি তখন রাস্তায় যানজটে, যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে হাসপাতালের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে যাচ্ছি।

সে হাসপাতালের গেটে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। গেটে যেতেই একটা সালাম দিয়ে সে তার পরিচয় দিল। বড় উঁচু দালানের আটতলায় এক বেডে তার ছেলে আছে বলে জানালো। পুরো দালানটাই একটা পরিকল্পিত বস্তি। ঘরের সামনে, রোয়াকে, মেঝেতে, বারান্দায় কাপড় কিংবা চট বিছিয়ে রোগী শুয়ে আছে। প্রতি ওয়ার্ডে বেডের তুলনায় রোগী আছে দশ গুণ। মানুষ গিজগিজ করছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বিশ্রী গন্ধ। রোগীর সাথে থাকা লোকজন হাসপাতালে বসতি গড়েছে। কেউ লিফটের সামনে পাটি বিছিয়ে শুয়ে আগেভাগেই রাতে শোবার জায়গা দখল করেছে, কেউ সিঁড়িতে বসে আছে,

কেউবা রোগীর পাশে বসা। সবাই বিপদে আছে। মনে হচ্ছে, দেশের সব মানুষ এই হাসপাতালে কোনো শোক পালনের জন্য জড়ো হয়েছে। প্রতি ওয়ার্ডের টয়লেট হাসপাতালে আসা নবাগত অতিথিকে দূর থেকে বিকট দুর্গন্ধ ছড়িয়ে তার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে, কিংবা অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, 'আমি এখানে আছি, প্রয়োজনে এখানে আসুন।'

অনেক কষ্টে আমাকে সঙ্গে করে ছেলের বেডে নিয়ে গেল। একটা টুল এগিয়ে দিয়ে বসতে বললো। ছেলের পাশে বসলাম। ছেলের গায়ে হাত দিয়ে নাম জিজ্ঞেস করলাম। বয়স একুশ-বাইশ হবে। একমাত্র ছেলে, মা-বাপের আশার আলো, বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন। পলিটেকনিকে পড়ে, শেষ বর্ষের ছাত্র। শরীরটা হাঁসা-হলদের মিশ্রণ, কঙ্কালসার। পরনের শার্ট উঁচু করে অপারেশনের জায়গাটা দেখালো। দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মা ছেলের জীবন রক্ষার্থে একটা কিডনি ছেলেকে দিয়েছে। ছেলের বিকল কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তাও প্রায় পাঁচ মাস হতে চললো। ছেলে ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠার কথা। অপারেশনের পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে গিয়েছিল। আবার অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, ক্ষতস্থানে ব্যথা করছে। ডাক্তার আবার হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছেন। একের পর এক ওষুধ দিয়ে চলেছেন। দামি দামি ইনজেকশন চলছে। সাথে প্রতিদিন নয়-দশটা ওষুধ খেতে হচ্ছে। ওষুধ কিনতে টাকার বড় অভাব।

এত ব্যয়ভার বহন ছেলের বাপের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। গ্রামে একখণ্ড জমি ছিল— বিক্রি শেষ। গোয়ালের গরুটা শেষ। ঘরের হাঁস-মুরগিও বেচা শেষ। মায়ের একটা কিডনি শেষ। এখন ছেলের মুখের অবসাদগ্রস্ত কথা, আর হলুদাভ চামড়া দিয়ে ঢাকা হাড়গুলোই ধ্বংসাবশেষ।

রোগীর মাথার কাছে রাখা আছে প্রেসক্রিপশনের ফাইল। একবার চোখ বোলালাম। ডাক্তারদের লেখা পাঠোদ্ধার বেশ কঠিন। তাছাড়া মেডিকেল টার্মিনোলজিগুলো পুরোটাই অজানা। মর্মোদ্ধার যতটুকু করতে পারলাম, প্রতিস্থাপিত কিডনিতে ইনফেকশন হয়ে গেছে, তেমন একটা কাজ করছে না, ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। বড় দুশ্চিন্তার কথা। প্রতিস্থাপনের পর সে কিডনিও অকেজো হয়ে গেলে, আর করণীয় কী থাকে!

রোগীর সিট ছেড়ে লোকটাকে সাথে নিয়ে হাসপাতালের উঁচু দালানের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। ঝাপসা হয়ে আসা মেঘলা আকাশে সূর্যরশ্মি নিস্তেজ হয়ে গেছে। সূর্যটা একটা গোলাকার রক্তিম থালায় পরিণত হয়ে বিদায় জানাতে যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কথার ফাঁকে ফাঁকে বার বার সেদিকে তাকাচ্ছি। ছেলেটার রোগক্লিষ্ট জীবনের সাথে অস্তগামী নিষ্প্রভ সূর্যের সমীকরণ মনে মনে মেলানোর চেষ্টা করছি।

ওদের গ্রামের পাশে বড় একটা বাজার। বাজারের অনেক মধ্যম ব্যবসায়ী বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবসায়ে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে। তাদের আয়-রোজগারের গড় করে দেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় না কী উঠে এসেছে। তাদের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছিল কিনা, জনে জনে তাদের নাম ধরে জিজ্ঞেস করলাম। সে সবার কথাই বললো। মাসের পর মাস পিছ পিছ ঘুরেও তাকে সব জায়গা থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। স্থানীয় নেতা ধরে এমপির কাছে আবেদন করেও ব্যর্থ হওয়ার কথা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো। বাজারের কিছু সাধারণ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দু-পাঁচশ করে হাজার দশেক টাকা জোগাড় করতে পেরেছে। এই টাকাগুলো নিয়ে এবার হাসপাতালে এসেছে। এ টাকায় বড়জোর এক সপ্তাহ চলবে বলে জানালো।

কথায় কথায় ছেলেবেলা থেকে তার কষ্টের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরলো। শুধু ছেলের দিকে তাকিয়ে তার শেষ সম্বল— বাপের রেখে যাওয়া একখণ্ড জমি বেচতে হয়েছে। সেটাও বললো। ধনীর বিপদে অনেক ধনী পাশে আসে, কিন্তু গরিবের বিপদে কেউ এগিয়ে আসে না, সে খেদোক্তিও করলো। নীরবে সব কিছুই শুনলাম।

গ্রামে-গঞ্জে রাজনৈতিক বাছবিচার ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক স্লোগানে ডাকলে যায় কিনা, জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে, হ্যাঁ, বললো। তারাও তার এ বিপদে প্রথমে বড় বড় কথা বললেও পরিণামে দিনের পর দিন ঘুরিয়েছে, কোনো সাহায্য করেনি বলে জানালো।

এরা এ দেশের ভাগবিমুখ শ্রেণি— আমি তা বুঝি, আজন্ম টিকে থাকার সংগ্রামে সদা ব্যস্ত। তবু প্রকৃতি এদের শেষ ভরসাটুকু কেড়ে নিতে চায়।

আমি তার বর্তমান অবস্থা ও চলমান সামাজিক অবস্থা, এ জনগোষ্ঠীর অতীত ও পরিবর্তিত মানসিকতা এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি। সে সাথে ভাবছি, এই অল্প

বয়সে ছেলেটার দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেল কীভাবে! এই একই ওয়ার্ডে শুয়ে থাকা অসংখ্য রোগীরও তো একই অবস্থা। বাইরে চলে-বেড়ানো মানুষের পোশাক দেখে ভিতরের অবস্থা বোঝা যায় না। বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিকে গিয়ে দেখলে বোঝা যায়, পুরো জনগোষ্ঠী কী রকম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে। সব সাধারণ হাসপাতালই যেন জনাকীর্ণ মাছের বাজার। রোগীর সংখ্যা কমানোর কোনো পরিকল্পনা কারো নেই। সবারই হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা। প্রতিটা পরিবারে শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে মারাত্মক কিছু রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এগুলো মহামারী রূপ নেবে। হাসপাতালের সংখ্যা বাড়িয়ে তখন আর কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। তখন দেশের নামের শেষে হাসপাতাল শব্দটা জুড়ে দিলে পুরো দেশটাই একটা হাসপাতাল হয়ে যাবে। এই ভূখণ্ডের স্বপ্নভরা দিগন্ত-বিস্তৃত শ্যামলিমার যে কোনো জায়গায়, যে কেউ শুয়ে চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে, অথবা অনন্তকাল ধরে ঘুমিয়ে থাকতে পারবে। আর বেশিদিন নয়, দেশটা একটা লাশের ভাগাড়ে পরিণত হবে।

আর হবে নাই-বা কেন? আজ সকালে উঠে যে চালটার ভাত খেয়ে এসেছি, সেটা মোটা চাল ছেঁটে কৃত্রিমভাবে ছোট দামি চাল বানানো। ইউরিয়া সার গোলানো পানির মিশ্রণে চকচকে পালিশ করা চাল। যে সব্জিটা খাচ্ছি, পুরোটাই কীটনাশক দিয়ে লকলকে করে তৈরি। যে ফলটা খাচ্ছি, কেমিক্যালে ভরা। যে মাছ বা মাংসটা খাচ্ছি, সবটাই ওষুধে ভরা। মাছ ও পোল্ট্রিসহ গবাদিপশুর খাবার তৈরিতে বিষাক্ত ট্যানারির বর্জ্যের নিত্য ব্যবহার। পেটের দায়ে মুড়ি কিনে খেলে, সেখানেও ইউরিয়া সার খাওয়া। প্রতিটা খাবারেই আজরাইল মেশানো। শরীর এবং মনই-বা আর পারবে কত! এ তো প্রকৃতির প্রতিশোধ। সোনার বাংলার ভেজাল-সোনার মানুষের আত্মঘাতী ভেজালের ছড়াছড়ি। নিখাদ ভেজাল খাওয়া— ভেজাল দেওয়া, ভেজাল বলা— ভেজাল চলা, ভেজাল মন— ভেজাল জীবনযাপন। সর্ব-ভেজালের এই দেশে আমি ভুক্তভোগীদের দিকে তাকাচ্ছি, আর আমিসহ তাদের পরিণতির কথা ভাবছি। আরো ভাবছি, আমরা কোন ঠিকানায় চলেছি। এ দেশে জন্মটাই কি এই ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠীর আজন্ম পাপ? না কি ভেজাল রাজনীতিবিদদের কর্মপাপের প্রায়শ্চিত্ত এরা জীবন দিয়ে উসুল করছে? আর ভাগ্যনিয়ন্তা সুচতুর-রাজনীতিবিদরা গদি নিয়ে টানা-হেঁচড়ায় বিভোর, মুখসর্বস্ব আত্মপ্রবঞ্চিত ভেজাল বক্তৃতায় মত্ত।

যত আইন, যত বিপদ– যার পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই তার জন্য। যত সমস্যা এই 'সুমহান ঐতিহাসিক রাজনীতিবিদ'দের নিয়ে। এই পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী বিকৃত ভেজাল-রাজনীতিই এ দেশের একমাত্র সমস্যা। সমস্ত অচলায়তনের প্রধান নিয়ামক।

এলোমেলো এসব কথা ভাবতে ভাবতে, তার কথা শুনতে শুনতে ইতোমধ্যেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বার বার নিজেকেও যেন অসহায় ভাবছি। চিন্তাটা দূর অজানায় হারিয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় রাখালদের সাথে গরু চরাতে দূর মাঠে যেতাম। যেতাম মূলত রাখালদের সাথে খেলা করার আকর্ষণে। এক সহচর রাখালকে প্রায়ই একটা গান গাইতে শুনতাম। গানের ভাবার্থ তখন মনে অতটা রেখাপাত করতো না, বরং পল্লীগানের টানা মেঠোসুরের দিকেই মনটা বেশি যেত। ঐদিন আজগর ভাইয়ের নিঃস্ব ছেলে ও নাতির করুণ বাস্তবতা শুনতে শুনতে বাল্যকালে শোনা সেই গানটার সুর সহসা মনে ভেসে এলো। সুরের তুলনায় গানের কথাগুলো এতদিনে হৃদয় ছুঁয়ে গেল:

'সারাটা দুনিয়া বেড়াইলাম ঘুরিয়া
মন মেলে মনের মানুষ মেলে না রে কাঙাল
কাঙাল হলে বন্ধু কেউ তো দেয় না রে কাঙাল।
আমি যে ডাল ধরি সে ডাল ভেঙে পড়ি
কোনো ডালে পাখির ভর তো নেয় না রে কাঙাল
কাঙাল হলে বন্ধু কেউ তো দেয় না রে কাঙাল।'

লোকটাকে সাথে নিয়ে ওয়ার্ডের কর্তব্যরত ডাক্তারের কাছে গেলাম। একজন জুনিয়র ডাক্তার সেখানে কর্মরত। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমাকে কিডনির কার্যকারিতা ও রোগীর অবস্থার অতীত-ভবিষ্যৎ জানালেন। রোগীর অবস্থা যে ভালো না, তা ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝালেন। প্রয়োজনে আবারো নতুন করে কিডনি স্থাপন করতে হতে পারে বলে জানালেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার কিডনি সংস্থাপন যে আদৌ কোনো আশার সংবাদ বয়ে আনবে না, তা উনি জানাতে ইতস্তত করলেন।

আমি বিষয়টা খোলসা করে গ্রামের ঐ নিরীহ-নিরক্ষর লোকটাকে আর খুলে বললাম না। অচিরেই অসহায় লোকটার বুকফাটা সর্বহারা কান্নার অপেক্ষায় রইলাম।

আবার ছেলেটার বেডের পাশে ফিরে এলাম। ছেলেটা এক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে পলিটেকনিকের অসমাপ্ত কোর্স শেষ করার অপেক্ষায় দিন গুনছে। কোর্স শেষে তার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আমাকে হাত ধরে অনুরোধ করলো। আমাকে দাদা বলে সম্বোধন করলো। সে তার কারণে বিক্রি

করা বাপের জমিখণ্ডটা আবারো কিনে দেবে বলে তার বাপকে সান্ত্বনা দিতে বললো। লোকটা ভবিষ্যতে আরো কিছু সাহায্যের অনুরোধ করলো। ছেলেটার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করলো।

আমি শুধু 'কোনো অসুবিধা হবে না, আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে সব হবে' ইত্যাদি কথা বলে আশার বাণী শোনাতে লাগলাম। এ যেন তেল-নিঃশেষিত সলতে-পোড়া নিভু নিভু প্রদীপের দিকে তাকিয়ে ভারসাম্যহীন প্রলাপ বকার নামান্তর।

বেশ রাত হয়ে যাচ্ছে। বাসায় ফেরার কথা ভাবছি। শরীরটাও বেশ খারাপ। ডায়াবেটিসের রোগী। দূর পথে বাসে চড়ে যাবার আগে ওয়াশরুম থেকে একবার ঘুরে আসার কথা ভাবলাম। বেশ দূর থেকে ওয়াশরুমের গন্ধ টের পাচ্ছি। ওখানে যেতে রুচিতে বাধছে, অথচ যাওয়া দরকার। ঐ ওয়ার্ডে কর্মরত একজনকে আর কোথাও কোনো ওয়াশরুম আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। উনি আরো দুই তলা উপরে নামাজের জায়গা ও অজুখানার পাশে একটা ওয়াশরুমের কথা বললেন। সেদিকে গেলাম। ওয়াশরুমে ঢুকলাম। কমোডের লো-ডাউন ও ট্যাপের পাইপ দিয়ে বেশ জোরে পানি পড়ে যাচ্ছে। বন্ধ করার অনেক চেষ্টা করেও বন্ধ করতে পারলাম না। পানি জোরে পড়তেই থাকলো। পাশে কোথাও মেশিন চলার শব্দ পাচ্ছি। বুঝলাম, দালানের ওভারহেড ট্যাঙ্কে পানি উঠানো হচ্ছে। পাশের আরো ট্যাপ দিয়েও পানি পড়ে যাবার শব্দ পেলাম। অনেক অস্বস্তির মধ্যে ওয়াশরুম ব্যবহার করলাম। কোনোক্রমেই লো-ডাউন ও ট্যাপের পানি বন্ধ করতে পারলাম না।

বুঝলাম, যতক্ষণ ওভারহেড ট্যাঙ্কে পানি উঠানো হয়, ততক্ষণ ট্যাপে পানি থাকে। তারপর পানিটুকু বিভিন্ন লো-ডাউন ও ট্যাপ দিয়ে পড়ে যায়। অনেক ট্যাপ ও লো-ডাউন বিকল। বিষয়টা দেখারও কেউ নেই, ভাবারও কেউ নেই। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে, হাসপাতাল চলছে— রোগক্লিষ্ট হাসপাতাল। দিন যায় রাত আসে, রাতের পরে দিন, তারপর আবার রাত। রোগীদের তুলনায় হাসপাতালের রোগ প্রকট। ওয়াশরুমে এসে বিপদে পড়ে গেছি। এ অবস্থায় ছেড়ে চলে আসতে বিবেকে বাধছে।

সহসা নামাজের রুম থেকে হাসপাতালের পোশাকে একজনকে বেরোতে দেখে তাকে একটা ধমক দেয়ার সুযোগ পেলাম। এভাবে সব পানি পড়ে যাচ্ছে, আর তারা এটা দেখেও দেখছে না, যে কোনোভাবে হোক, সে এটা বন্ধ করুক— ইত্যাদি বলে নীচে নেমে এলাম। দেখলাম, সে এটা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তার মধ্যে কোনো অস্বস্তি বোধ নেই।

ভাবলাম, এই বড় হাসপাতালের নিশ্চয়ই একজন প্রধান আছেন, আছেন এ দেশে স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান। তাঁদের কেউ যদি কখনো সহসা পরিদর্শনে এসে হাসপাতাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত উঁচু থেকে নিম্ন ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে একদিনে চাকরিচ্যুত করতেন, তাহলে এ অসহনীয় অব্যবস্থা ও অপচয় একদিনেই বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু এ দেশে তা বিরল। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যারা আছেন তাঁরাও কোনো না কোনো রাজনৈতিক অঙ্গসংগঠনের সাথে যুক্ত। তাদের টিকি ছোঁয়া ভার। কিছু বলতে গেলে উল্টো জীবন বাঁচানো দায়। রে-রে করে পিছন পিছন তেড়ে আসবে। সবাই দেশের উন্নয়নের(?) কাজে মহাব্যস্ত। পানি কোথা দিয়ে পড়ে গেল, এটা দেখার মতো সময় তাদের কোথায়?

চারপাশে তাকালাম, দায়িত্ববান এবং আদর্শ প্রশাসন এ দেশে কোথায়! আশি মণ ঘিও আর জোটে না, রাধাও আর নাচে না। সবকিছুতেই সমাধান 'পর্বতের মূষিক প্রসব'।

এ দেশের সব প্রাকৃতিক সম্পদই এভাবে নিঃশেষ হয়ে ড্রেনে চলে যাচ্ছে, কিংবা চলে যাচ্ছে রাজনৈতিক রংমাখা ধান্দাবাজ-দলবাজ শোষকদের পকেটে। আর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মেরুদণ্ড শক্তি— আজগর ভাইয়েরা মরে বাঁচলেও, তাঁদের পরবর্তী বংশধরেরা, অস্বাস্থ্যকর বস্তিসদৃশ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে এবং জীবন বাঁচানোর অপেক্ষায় নিশিদিন নিয়তির পাতা গুনছে।

ঐদিন বেশ রাতে বাসায় ফিরে এসেছি। অসুস্থ শরীর নিয়েই হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। রাতে শরীরে বেশ জ্বর। প্রায় সারারাত নির্ঘুম অবস্থায় ভাগ-বিমুখ অসহায় এ লোকগুলোর কথা ভেবেছি। এ দেশের মুক্তির জাগরণে তাদের অবদানের কথা ভেবেছি। এ দেশের ধূর্ত পলিটিক্যাল টাউটদের পঁয়তাল্লিশ বছরের জাবরকাটা বুলি অন্তরের মাঝে তোলাপাড়া করেছি। শতকরা আটানব্বই ভাগ জনগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ সমর্থনে অর্জিত স্বাধীনতা কিছু অতি উৎসাহী সুবিধাবাদী চাটুকারের কুক্ষিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবার দৃশ্যকাব্য দেখেছি। অসম সমীকরণ অমীমাংসিত রেখেছি। আর ছেলেটার সুনিশ্চিত খারাপ খবরের দিনটায় তার বাপকে কী বলে সান্ত্বনা দেব, সে কথা খুঁজে পাবার অপেক্ষা করেছি।

দেশের এহেন অবস্থায় এই শেষ বয়সে এসে আমাদের গ্রামের সেই করম আলীর কথা খুব মনে হয়। করম আলী মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নীচুস্বরে একটা গান অবিরাম গেয়ে গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটতো। কোনোদিকে খেয়াল করতো না। সবাই

বলতো করম পাগলা। আজ সেই করম আলীকে খুব মনে পড়ে। করম আলীর মুখে সেই গানটা শুনতে আবারও খুব ইচ্ছে হয়। আরো ইচ্ছে হয় একটা কবিতার কয়েকটা পঙ্‌ক্তি বার বার পড়তে—

‘ কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি ...
পঁচিশ বছর প্রতিক্ষায় আছি।
মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে।
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?’

ভোর রাতে কখন যেন ঘুমিয়ে গেছি। দেখি, সেলিম ভাই ও সুদূরী আমার কাছে এসেছে। আমি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। বেডে শুয়ে আছি, সেলিম ভাই আমাকে বলছে, ‘তোর দুটো কিডনিই কীভাবে নষ্ট হয়ে গেল? আমার একটা কিডনি তোকে দেব, তুই কোনো চিন্তা করিসনে। দুজনে বেঁচে থাকা যাবে’। আরো বলছে, ‘আচ্ছা, তোর কি আমাদের গ্রামের সেই করম পাগলার কথা মনে পড়ে? তার গানটা কি তোর আজো মুখস্থ আছে?’ সুদূরী বেডের পাশে এলো। দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে শুনে অনেকক্ষণ চোখের পানি ফেললো। তেমন কিছু বললো না। সুদূরীকে দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি ভাবছি, সুদূরী হয়তো বলবে, ‘তুমি তো জানো, তুমি ছাড়া আমার জীবন অসমাপ্ত, আজীবন তোমার অপেক্ষায় আছি। সারাটা জীবন তোমাকে খুঁজছি। সেলিম ভাই আমাকে তোমার সাথে দেখা করিয়ে দেবে বলে নিয়ে এসেছে। চলো, আমার একটা কিডনি তোমাকে দিই। তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি। দুজনে নতুন করে ঘর বাঁধি। আমি তোমার সাথে ঘর বাঁধার অপেক্ষায় আছি।’

কিন্তু না, সুদূরী এসব কথা কিছুই বললো না, এড়িয়ে গেল। শুধু বললো, ‘তোমার কষ্ট দেখলে আমি খুব কষ্ট পাই। তুমি নিশ্চয়ই সারাটা জীবন আমার উপর অনেক অভিমান করে আছো। শরীরের উপর অনেক অত্যাচার করেছো। তুমি খুব অভিমানী।’

বললাম, আর্তপীড়িতকে দেখলে কার না কষ্ট লাগে? আমার কী এমন অধিকার আছে যে, আমি তোমার উপর অভিমান করবো? তুমি তো ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতি, সংসার ও বিশাল বিত্ত-বৈভব নিয়ে সুখেই আছো। এত সম্পদের মাঝে থেকেও এই মৃতপ্রায় হতচ্ছাড়া সজীবকে শেষবারের মতো একবার চোখের দেখা

দেখতে এসেছো, সহমর্মিতা দেখাতে এসেছো, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে তুমি এখনো ভালোবাসো, এটা আমি জানি। তবে সে ভালোবাসা স্বামী-সংসার ও ছেলে-মেয়ের প্রতি ভালোবাসার ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমার জন্য এ-সময়ে তুমি তোমার কতটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতে চাইবে, এটা আমি বুঝি। তোমার এ ভালোবাসা নিছক স্মৃতি-কাতরতা ছাড়া আর কিছুই না। তুমি এতদিনে তোমার ছেলে-মেয়ে, স্বামী-সংসার ও বিত্ত-বৈভবকে আমার চেয়ে বেশি আপন ভেবে ফেলেছো। তাদেরকে ছেড়ে তুমি আমার সাথে নতুন করে ঘর বাঁধতে আসবে না, আমি তা জানি। তুমি তোমার সুখশান্তিকে বিসর্জন দিয়ে, জেনেশুনে আমার এ অন্তিম জীবন-বোঝা বইবেই-বা কেন! তুমি কিডনি দিতে আসবে না, তাও আমি বুঝি। আবার, তুমি কিডনি দিতে চাইলেই আমি তা নেব– এটাও ভেবো না। আমার এ কিডনি রোগ, তোমার অগ্নিপরীক্ষা, আমার জন্য তোমার ত্যাগের পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় তুমি জিতবে, কী হারবে, তোমার মনই তা বলে দেবে। আমি তোমাকে কখনোই আমার জন্য বিত্ত ও সংসারত্যাগী হতে বলবো না, তা জেনো। তোমার সংসার তুমি করবে, সুখে থাকবে– এতে আমার আপত্তি থাকবে কেন? আমি বুঝি, তুমি তোমার যুগোপযোগী স্বামী, তার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও সামাজিক সম্মানের গর্বে প্রচ্ছন্ন গরবিনী। স্বার্থান্ধতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা একান্ত আপন মানুষকেও কাছে পাওয়ার অন্তরায়। ভালোবাসতে হলে উদার ও স্বার্থত্যাগী হতে হয়। সে ত্যাগের মহিমা তোমার কোথায়? পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস ভালোবাসার ভিত্তি। তুমি তো শুধু আমার 'সুদূ' নও, তুমি 'সুদূরিকা', তুমি আজীবন আমার কুহেলিকা। তোমার সৃষ্টি আমার আমৃত্যু অন্তর্দাহ। এই শুকিয়ে-যাওয়া ফুলে ক্ষীণ গন্ধ থাকলেও তা দিয়ে তুমি মালা কখনোই গাঁথবে না, তা আমি জানি। এই ভোগবাদী জীবনে একজন আধমরা ব্যক্তিকে স্মৃতির দৃষ্টিপথ থেকে যত দ্রুত পাশে ঠেলে পাঠানো যায় ততই মঙ্গল, জীবনযাপন সহজ হয়ে যায়, চলার পথের মসৃণতা ততই বাড়ে। নিশ্চয়ই তুমিও তাই চাও।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। দেখি, জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঘরে ঢুকেছে। গায়ে কাঠফাটা তাপমাত্রায় জ্বর। শরীরটা থর থর করে কাঁপছে। দুপাশের কিডনিতে সত্যি সত্যিই ব্যথা করছে। বিছানায় সোজা হয়ে বসতে পারছিনে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ঢাকার রাজপথে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ ঘণ্টা যানজটে কালো ধোঁয়ার মধ্যে বসে থেকে থেকে এ শ্বাসকষ্ট আমি দীর্ঘদিনের অনেক সাধনায় অর্জন করেছি।

বুকের অবস্থাও খারাপ, বুকে ব্যথা করছে। বুঝলাম, স্বাধীনতার চার দশক পরের এ দেশের প্রভূত উন্নয়ন-জোয়ার(?) দেখার অপেক্ষার সময় আমার আর নেই। আমার জীবননদীতে ভাটার টান এসে গেছে। সে টানে তো সাড়া দিতেই হবে। 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু আমি— তাই ভাবি মনে, জীবন প্রবাহ কালসিন্ধু পানে ধায় ফিরাই কেমনে।' আবার বালিশে মাথা রাখলাম। বাস্তবতায় ফিরে এলাম।

বার বার মাথায় আসছে, সেলিম ভাইয়ের অতৃপ্ত আত্মা কেন এতটা বছর ধরে আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে? তাহলে কি সেলিম ভাই আমার জীবদ্দশায় আমাকে ছেড়ে যাবে না? নিজেই উত্তর খুঁজছি, সেলিম ভাই আমাকে ছেড়ে যাবে কী করে? সে তো এখন আর একা না। এ দেশের হাজার হাজার স্বপ্নভরা জীবন্ত মুখ প্রতিদিন এখনো সেলিম ভাইয়ের কাতারে শামিল হচ্ছে। তারা তাদের খেলার সাথী সজীবদের ছেড়ে থাকবে কী করে?

আবার ভাবছি, সেলিম ভাই আমাকে হঠাৎ করম পাগলার কথা জিজ্ঞেস করলো কেন? তার গানটা দিয়ে সেলিম ভাই এখন কী করবে?

করম আলী গ্রামের সাধারণ মানুষ। জেলা শহরে যাতায়াত করতো। শহরের এক মেয়ে ভালোবাসার ছলনায় ফেলে করম আলীকে বিয়ে করে। বিয়ের বেশ কিছুদিন পর দিনে দিনে করম আলী বুঝতে পারলো, তার ভালোবাসার সখী আসলে বাজারের মেয়ে। করম আলীর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সবাই দেখে, করম আলী রাস্তা দিয়ে নিজ মনে একা একা হাঁটে, মাথা দোলায়, আর একমনে একটাই গান গায় 'আমি যা চেলাম তা পেলাম কই, তুমি কেন মজালে সই বাজারে এনে?'

মনে আরো প্রশ্ন, সুদূরী কীভাবে এতদিনে সেলিম ভাইয়ের দেখা পেল? তাহলে সুদূরী কি কোনোদিনই সুখী হতে পারেনি? সুদূরীর স্বামী যে ব্যবসায়ী-রাজনীতির তরিকা নিয়ে আপামর জনগণের কোষাগার লুট করছে, মানুষকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ছে, আর সেলিম ভাইদেরকে নিরুদ্দিষ্ট জীবনে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সুদূরী কি এসব বোঝে? সুদূরী কি এসব নিয়ে ভাবে? না কি ঐশ্বর্যের মোহে অন্ধ হয়ে গেছে? সুদূরী হয়তো সম্পদের মোহে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনাশক্তি, আত্মবিশ্লেষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। বন্ধুমহলে শোনা, অতীতে আমি যে সুদূরীকে দেখেছিলাম ও নিজের করে পেতে চেয়েছিলাম, সে

সুদূরী অনেক বদলে গেছে। সময়ের পরিবর্তনে আমার সুদূরী আত্মস্বার্থ বুঝতে শিখেছে।

এক সময় সুদূরী ও আমার মাঝে প্রধান বাধা ছিল নির্বিচার গণহত্যার ভয়— সে দুর্বিষহ দিনগুলো আমাকে সুদূরী থেকে আজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন করেছে। সুদূরীর কাছে আমি হয়েছি অবিশ্বাসী। সুদূরীর স্বামী তাদের বর্তমান উত্তরাধিকারী। আরো বাধা ছিল— যোগাযোগের অব্যবস্থা ও সামাজিক রক্ষণশীলতা। এ সুদীর্ঘ বছরে সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও এসেছে আমূল পরিবর্তন। যদিও দলীয় সন্ত্রাস, জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক অশান্তি এখনো রয়ে গেছে।

সুদূরী ও আমার দুটো জীবন একই মোহনায় মিলিত হবার পথে এখনো হয়তো-বা বাধা নয় সুদূরীর মন। বড় বাধা সুদূরীর আত্মকেন্দ্রিক স্বভাব, তার স্বামীর বিপুল অর্থশক্তি, অস্ত্রশক্তি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, বৈধ-অবৈধ বাহিনীকে টাকা দিয়ে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বশ করার ক্ষমতা, বিচারহীনতা। এগুলো সুদূরীকে সাথে নিয়ে আজো আমার বেঁচে থাকার পথে বড় হুমকি হয়ে রয়ে গেছে।

আমি তো তার সুখের সংসারে কোনো বাধা হতে কোনোদিনই চাইনি, এখনও চাইনে। সারাটা জীবন তো তার রেখে-যাওয়া স্মৃতিকে সম্বল করে একাকী নীরবে এমনভাবে পথে পথেই কাটিয়ে দিয়েছি। ভুল ঠিকানায় তাকে খুঁজে ফিরেছি। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে আমি কোনোদিনই ধরতে পারিনি মগডালে বসে-থাকা সুখের পাখি। বুঝতে পারিনি ভাগ্য-বিধাতার শুভঙ্করের ফাঁকি। সুদূরীর মোহাবিষ্ট হয়ে মায়ামৃগ ধরতে তার সুখস্মৃতির পিছনে আজীবন ছুটতে ছুটতে এখন বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি, ক্লান্ত হয়ে গেছি। মনে অবসন্নতা এসেছে। সুদূরীর মুখচ্ছবি আমার এ নিষ্ফলা জীবনাকাশে পূর্ণমূখীর চাঁদ হয়ে জেগে আছে। আমার এ জীবনপ্রদীপ নিভে গেলেই সে চাঁদ অমাবস্যায় চিরদিনের মতো পুরোপুরি ঢেকে যাবে। এখন আমি জীবন-সাগরের প্রান্তরেখায় এসে দাঁড়িয়েছি। তার জন্য আমার এ আত্মত্যাগ, জীবন-বিনাশ তার কাছে অজানা এবং অভাবিতই রয়ে যাবে। আমি এমনই একটা না-ফোঁটা ফুল, যা জীবনের কুঁড়িতেই পোকায় খেয়েছে। চিতার আগুন যেভাবে মৃতকে পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করে, স্বজন হারানোর অব্যক্ত-অবিরাম অন্তর্দাহ সেভাবে জীবিতকে তুষের আগুনের মতো আজীবন ধিকিধিকি জ্বালিয়ে হৃদয়কে দগ্ধীভূত করে। আমি জানি, এ দহনের সমাপ্তি আমার জীবনাবসান।

এখন সুদূরীর দৃষ্টিপথের দিকে তাকালেই আমার চোখে ভেসে ওঠে তার মনভোলানো স্বামী-সংসার, ছেলে-মেয়ে নিয়ে হাসিখুশিভরা উল্লসিত মুখ। তাই আমার এ জীবনে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই, শখ-আহ্লাদ নেই, নেই কারো প্রতি কোনো অভিমান অভিযোগ। এখন নিয়তির হাত ধরে অনেক দূরে একাকী দাঁড়িয়ে, তার পথের দিকে চেয়ে শুধু দেখা— ও ভালো আছে, সুখে আছে, এই আমার সান্ত্বনা। তার সুখই আমার সুখ। আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দিগন্ত-বিস্তৃত অপেক্ষা— তার মুখখানা একবার দেখার অপেক্ষা।

আমার সংশয়, যে সুদূরীকে একসময় শত শত বার দেখেও তৃষ্ণা মেটেনি, তার সেই চিরকাঙ্ক্ষিত মুখ যুগ যুগ ধরে আজ দৃষ্টির অন্তরালে। তাকে কি এখন আমি দেখে প্রথমেই চিনতে পারবো? সুদূরীর সেই মাথা-ভরা, নিতম্ব বরাবর লম্বা চুল নিশ্চয়ই আর নেই। সেই কিশোরী সুদূরীর গলা ও চোয়ালের চামড়া নিশ্চয়ই এতদিনে কুচকে গেছে, চুলগুলো নিশ্চিত সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু সেই ডাগর দুটো তীক্ষ্ণ চোখ, আড়চোখের চাহনি? নিশ্চয়ই আমি প্রথম দৃষ্টিতেই ওকে চিনে ফেলবো।

মনে সন্দেহ, এত যুগ পরে সুদূরীও আমাকে চিনতে পারবে কিনা। আমার মাথার সেই ঘন কালো চুল কবেই উঠে গেছে। এখন মাথার তিন-পাশ ঘিরে পাটের আঁশের মতো পাকা চুল। নিষ্পিষ্ট জীবনের ক্ষয়িত শরীর। অযত্ন অবহেলায় লালিত বিরহের খরতাপে ঝলসানো, রোগে-শোকে দগ্ধীভূত কদর্য মুখশ্রী।

হয়তো প্রথমে চিনতে পারবে না, কিংবা আচমকা চিনেও না চেনার ভান করে এড়িয়ে যাবে। দৃষ্টি বিনিময় হবে। যেভাবেই হোক, দেখা আমাদের একদিন হবেই, সেজন্য আমার প্রতীক্ষা। এই আমার প্রত্যয়, এই আমার অপেক্ষা— জীবনান্ত অপেক্ষা।

বাবলা বনের ধার ঘেঁষে ঐ পুবের দিঘল মাঠে
সরষে ক্ষেতের মধ্যি দিয়ে একপেয়ে পথ গিয়েছে যে পথে
দূর দিগন্তে মিশে—
তারই প্রান্তে বিছিয়ে তোমার আঁচল
থাকবে বসে আসবো আমি ভেবে,
সেই আসাতে আবার দেখা হবে।
তোমার সাথে আমার দেখা হবেই হবে জেনো,
সেই সে পথে পেয়েছি তোমার দিশে।

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভার্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো।

চৌত্রিশ বছর ধরে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই:

জীবনক্ষুধা
প্রতিদান চাইনি
কিছু কথা কিছু গান

হাসনান আহমেদ পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি এমন একটি বিষয় পড়ান যা একালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যবসায় অনুষদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বলা হয়: শেকসপিয়র নিউটন হতে পারেন। হাসনানের মধ্যেও এমন একটি মন, প্রতিভা ও অভিনিবেশ রয়েছে। আমরা সহজেই বুঝতে পারি তিনি একজন সংবেদনশীল মানুষ। ফলে কালের নীরব সাক্ষী হয়ে কোনোভাবে জীবন পার করতে পারেন না। নিজের অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা, প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনা, নানা অনুভূতি, সমকালীন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সমাজ-সংগঠনের পরিচয় অনেকটা আত্মজৈবনিক ভঙ্গিতে বর্তমান গ্রন্থ 'অপেক্ষা'য় তিনি তুলে আনতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর মতে, জীবনেরই আর এক নাম অপেক্ষা। একটি আশা পূরণ হলে মানুষ আর-একটির অপেক্ষায় থাকে। লেখকের সেই অপেক্ষা ও অতিবাহিত প্রহরান্তের প্রাপ্তির সঙ্গে আমরা সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। সে-হিসেবে রচিত গ্রন্থটি ভিন্ন পরিচিতি লাভ করেছে, হয়ে উঠেছে লেখকের সমকালীন সমাজ-সংগঠনের গতিপ্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনবৈচিত্র্য, পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক বা আত্মমগ্ন উপাখ্যান।

বইটি সুখপাঠ্য। আমি চাই এর পাঠকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাক।

অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়